সীতা

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত

পতিব্রতা গ্রন্থাবলী

সীতা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত-লেখক
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু বি, এ, প্রণীত।

কলিকাতা
১৩২০।

মূল্য ॥০ আনা
উৎকৃষ্ট বাঁধাই ৸০ আনা

৯১।২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নববিভাকর প্রেসে
শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগীর দ্বারা মুদ্রিত।
এবং
৩০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী হইতে
শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের বহু অভাবের মধ্যে হিন্দু মহিলার পাঠের উপযোগী আখ্যান-গ্রন্থের অভাব অন্যতম। হিন্দু পারিবারিক জীবনের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যাহা হইতে আনন্দ ও উপদেশ লাভ করিতে পারা যায় তাদৃশ আখ্যান-পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় প্রকৃতই বিরল। নিজের শক্তি অনুসারে এই অভাব, কিয়ৎপরিমাণে, মোচনের জন্য আমি ভারতের পতিব্রতা কুলের শীর্ষস্থানীয়া কয়েকটী পৌরাণিক মহিলার চরিত্র উপন্যাসাকারে বর্ণন করিয়া পতিব্রতা নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছি। তাহার প্রথম ভাগে সতী, শকুন্তলা, দময়ন্তী ও শৈব্যাদেবীর এবং দ্বিতীয় ভাগে গান্ধারী, সুনীতি, সাবিত্রী ও সীতাদেবীর চরিত্র বিবৃত হইয়াছে। অনেকেই তাহা পাঠ করিয়া প্রীতিপ্রকাশ করিয়াছেন এবং অনধিক কালের মধ্যে প্রথম মুদ্রাঙ্কনের দুই সহস্র পুস্তক নিঃশেষ হওয়ায় সম্প্রতি তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি আদৃত হইলেও মুদ্রাঙ্কনের পারিপাট্য ও ত্রিবর্ণের চিত্র-সন্নিবেশ ইত্যাদি কারণে আমি তাহা ইচ্ছানুরূপ সুলভ করিয়া সাধারণের অধিগম্য করিতে পারি নাই। পুস্তকসন্নিবিষ্ট আখ্যান গুলি যখন পরস্পর নিঃসম্বন্ধ তখন তাহাদিগের এক একটী, স্বতন্ত্র ভাবে, অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে, প্রকাশ করিলে কাহারও অসুবিধা হইবে না বরং অনেকের সুবিধা হইতে পারে এই বিবেচনায় আমি পতিব্রতা দ্বিতীয়ভাগের সীতা আখ্যান বর্ত্তমান আকারে প্রকাশ করিলাম। পতিব্রতায় সন্নিবিষ্ট আখ্যানের সহিত কোনও বিষয়ে ইহার পার্থক্য নাই।

আমার লিখিত আখ্যানে আমি অবিকল মূলের অনুসরণ করি নাই। বহু আলোচিত এবং চিরপরিচিত বিষয়কে চিত্তাকর্ষক করিতে হইলে নূতনত্বের সমাবেশ আবশ্যক; এইজন্য, মূল রক্ষা করিয়া, আমি, স্থলে স্থলে, নিজের কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। আশা করি তদ্দ্বারা মূল চরিত্রের গৌরবহানি হয় নাই। কালিদাস ও ভবভূতি হইতে মধুসূদন পর্য্যন্ত শত শত ভারতীয় মহাজন যে পথে গমন করিয়াছেন, আমি সেই পথেই গমন করিয়াছি। সুতরাং আমার এরূপ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন নিন্দনীয় হইবে না বলিয়া সঙ্গত আশা করিতে পারি।

যে উদ্দেশ্যে সীতা লিখিত হইয়াছে, ইহা তাহার উপযোগী হইয়াছে বিবেচিত যইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি

৩৫ নং গুয়াবাগান লেন,
কলিকাতা;
১৩২০।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

চিত্রসূচী।



বালিকা সীতাদেবী।　　　সৌঃ প্রবাসীপত্র

সীতা।



প্রথম পরিচ্ছেদ।

ফাল্গুনের সুখদোষ্ণ সমীরণের স্পর্শে মিথিলার আম্রকানন মঞ্জরিত হইয়াছে। বৃক্ষে, বৃক্ষে মধুধারা ক্ষরিত হইতেছে এবং মধুগন্ধে আকৃষ্ট মধুপকুলের গুনগুন শব্দে তরুকুঞ্জসমূহ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। পুষ্পিত কিংশুকতরুসমূহের রক্তিম আভায় মিথিলার গ্রামান্ত সমুজ্জ্বল, নবোদ্ভিন্ন কিশলয়ে বনস্থল শ্যামায়মান, এবং সুপুষ্ট যবাঙ্কুরে ক্ষেত্রসমূহ স্বর্ণাভ। উপবনসমূহ বনমল্লিকার সৌরভে সুরভিত হইতেছে। আকাশ উজ্জ্বল নীল; দিঙ্‌মণ্ডল কুজ্ঝটিকা-শূন্য, কোকিলকুল কুহুরবে পৃথিবীতে বসন্তের আগমন ঘোষণা করিতেছে।

ফাল্গুনমাস বিবাহের মাস; তাই মিথিলাবাসীদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের গৃহে বিবাহযোগ্য কুমার, কুমারী আছেন, তাঁহারা, প্রতিবাসিগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া, হরগৌরীর বিবাহ-গীতি গান করিতেছেন। গৃহে, গৃহে বৈবাহিক উৎসবের আয়োজন হইতেছে। কেহ হরিদ্রা, পাটল প্রভৃতি বর্ণে বস্ত্র রঞ্জিত করিতেছে, কেহ লাক্ষারাগ সংগ্রহ করিতেছে, কেহ জাতিফল ও আমলকী চূর্ণ করিতেছে। পুরবাসিনীদিগের ব্যস্ততার সীমা নাই; কোন চিত্র-কলা-নিপুণা বর্ণ-সংযোগে গৃহদ্বারে ঐরাবতারূঢ়া ইন্দ্র ও শচীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতেছেন; কোন চিত্রপ্রিয়া পিষ্টতণ্ডুলজলে বিবাহমণ্ডপে

এবং নববধূর গৃহ-প্রবেশ-পথে কেতকী ও কদম্ব কুসুম রচনায় নিযুক্তা আছেন, আবার কোন সূপকার্য্য-পারদর্শিনী, সঙ্গিনীগণের সহিত, মোদকলড্ডু নির্ম্মাণে ব্যাপৃতা রহিয়াছেন। রন্ধনশালা হইতে হৈয়ঙ্গবীনের গন্ধ চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইতেছে। যে সকল গৃহে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহা হইতে, মধ্যে মধ্যে, শঙ্খ-ধ্বনি দ্বারা বৈবাহিক উপহার প্রেরণের বা প্রাপ্তির সংবাদ ঘোষিত হইতেছে। পুরবাসিগণের এই আনন্দ ও উৎসাহ রাজভবনেও লব্ধপ্রসর হইয়াছে। রাজকুটুম্বিনীগণ ভাবিতেছেন, "ফাল্গুন ত আসিয়াছে, আমাদিগের রাজকুমারীর বর কি আসিবেন না ?"

রাজা জনক মিথিলারাজ্যের অধিপতি। একদিকে হিমাচলের পাদদেশ, অপর দিকে ভাগীরথী-তীর ; একদিকে গণ্ডক, অপর দিকে কৌষিকী, তাঁহার সুবিস্তৃত রাজ্যের সীমা। ঐশ্বর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে ভারতভূমিতে তাঁহার রাজ্যের তুলনা নাই। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য প্রকৃতি তাহা মুক্ত হস্তে দান করিয়া মিথিলার রমণীয়তা সম্পাদন করিয়াছেন। তরুলতা স্নিগ্ধ-শ্যাম মূর্তিতে সম্বৎসর এখানে নয়ন প্রীত করে, বিহগের মধুর সঙ্গীতে এখানে নিরন্তর কর্ণ পরিতুষ্ট হয়, পুষ্পের সৌরভ এখানে একদিনের জন্যও নাসিকার পরিতোষে বিরত থাকে না, এখানকার ফল অমৃতের অপেক্ষাও মধুর আস্বাদনে রসনার তৃপ্তি দেয় এবং নাতিশীতোষ্ণ বায়ু মধুর হিল্লোলে এখানে চিরদিন শরীর স্নিগ্ধ করিয়া রাখে। কিন্তু এই অক্ষয় ভোগ-ভাণ্ডারের মধ্যে বাস করিয়াও রাজা জনক সুখে অনাকৃষ্ট এবং ভোগে অনাসক্ত। তাঁহার রাজধানী অমরাবতীর ন্যায় শোভাময়ী, তাঁহার ভাণ্ডার কুবেরের ভাণ্ডারের ন্যায় রত্নাঢ্য, তাঁহার উপবন নন্দনকাননের ন্যায় রমণীয়। কিন্তু এই অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বাস করিয়াও তিনি সংসারে উদাসীন। গৃহস্থাশ্রমের

সকল বিষয়েই তাঁহার পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি, কিন্তু পার্থিব কোন সুখই তাঁহার চিত্ত অধিকারে সক্ষম নয়। রাজপ্রাসাদে বাস করিয়াও তিনি তপোবনবাসী এবং সিংহাসনে আসীন হইয়াও তিনি কুশাসনস্থ। লোকে যখন দেখিত তিনি রাজস্ব-সচিবের সহিত রাজ্যের আয় ব্যয়ের, সান্ধিবৈগ্রহিকের সহিত সন্ধি বিগ্রহের এবং প্রাড়্‌বিবাকের সহিত বিচারকার্য্যের আলোচনা করিতেছেন, তখন তাঁহার চিত্ত ভগবৎপদারবিন্দধ্যানে মগ্ন থাকিত। অষ্টাবক্রের ন্যায় বেদ-বেদাঙ্গবিৎ ঋষি এবং গার্গীর ন্যায় ব্রহ্মবাদিনী তপস্বিনী আসিয়া তাঁহার সহিত শাস্ত্রালোচনা করিতেন, আবার তাঁহার ক্ষেত্রপাল আসিয়া তাঁহার নিকট ব্রীহিযব উৎপাদনে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিত। ধনজনে এবং বিলাসদ্রব্যে পরিবৃত থাকিয়াও সংযমে ও বৈরাগ্যে তিনি ঋষি এবং স্বাধ্যায় ও সাধনে ব্যাপৃত থাকিয়াও বিষয়ভোগে তিনি রাজা; তাই লোকে তাঁহাকে "রাজর্ষি" এই অনন্যসাধারণ উপাধি দান করিয়াছিল।

রাজা জনকের রাজধানী মিথিলানগরীও সর্ব্বাংশে তাঁহার উপযুক্ত ছিল। তাহা এক দিকে বিলাস-সুখের, অপরদিকে বৈরাগ্য-সাধনের উপযোগী উপাদানে পূর্ণ থাকিত। একদিকে ধনিজন-সেবিত অট্টালিকা, অপর দিকে তাপসজনাশ্রিত পর্ণশালা; এক-দিকে নূপুরসিঞ্জন-মুখরিত সঙ্গীতাগার, অপর দিকে সামগান-ধ্বনিত যজ্ঞভূমি; এক দিকে বাহ্বাস্ফোট-বিকম্পিত মল্লভবন অপর দিকে শান্তিরসাস্পদ দেবালয় মিথিলা-নগরীর শোভাবর্দ্ধন করিত। বিষয়াসক্ত সেখানে আসিয়া দেখিত, পর্ব্বতাকার অট্টালিকাসমূহ দণ্ডায়মান, রাজপথ অশ্ব, গজে আকীর্ণ, বিপনী সমূহ বহুমূল্য মণিমুক্তায় এবং রসনাতৃপ্তিকর সুমিষ্ট দ্রব্যে পূর্ণ। আবার তাপসজন সেখানে আসিয়া দেখিতেন, সরোবরতীরে

যজ্ঞার্থ বেদী নির্ম্মিত হইয়াছে, যূপকাষ্ঠসমূহ প্রোথিত রহিয়াছে, দ্বিজগণ তরুতলে সাম গান করিতেছেন এবং স্বয়ং রাজ্যেশ্বর, সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক, গৃহতলে কুশাসনে বসিয়া, কৌপীন-ধারী কোন তপস্বীর সহিত আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ বিচার করিতেছেন। জনককে দেখিয়া অন্যান্য নৃপতিগণ ভাবিতেন, যদি ধনজনাঢ্য, প্রকৃতিরঞ্জক রাজা কেহ থাকেন, তবে সে জনক; আবার তাপসগণ ভাবিতেন, যদি মন্ত্রদ্রষ্টা, ব্রহ্মপরায়ণ ঋষি কেহ থাকেন, তবে সে জনক। তাই লোকে যুগে যুগে ঘোষণা করিয়া আসিতেছে, "যদি সংসার করিতে হয়, তবে রাজা জনকের মত কর।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রাতঃকালীন হোম সমাপনান্তে, একদিন, রাজা জনক আপনার অগ্নিশরণ-গৃহে উপবিষ্ট আছেন। চতুর্দ্দিকে পঞ্চযজ্ঞের উপকরণ-সমূহ সজ্জিত রহিয়াছে; ধূপগন্ধে ও নানা জাতীয় পুষ্পের সৌরভে গৃহ আমোদিত হইতেছে; অল্পক্ষণ পূর্ব্বে রাজা যে অগ্নিতে হোম করিয়াছিলেন, তাহা হইতে সুগন্ধি ধূম, কুণ্ডলিত হইয়া, ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে। রাজা মূর্ত্তিমান ব্রহ্মচর্য্যের ন্যায় লক্ষিত হই-তেছেন। তাঁহার ললাটে, বক্ষে, বাহুতে চন্দন-মিশ্রিত বিভূতিরেখা, এবং কণ্ঠে রুদ্রাক্ষদাম; তাঁহার পরিধান শুভ্র কৌষিক বসন। তাঁহার সম্মুখে, স্বতন্ত্র আসনে, যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার ললাট প্রশস্ত, নাসিকা উন্নত, বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল; দেহ ক্ষীণ কিন্তু তপঃপ্রভায় প্রদীপ্ত। ব্রহ্মবিদ্যায় তিনিই জনকের উপদেষ্টা। গৃহ নীরব; রাজা ভক্তি-বিনম্রভাবে মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিতেছেন। মহর্ষি বলিলেন, "বৎস!

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূত ভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্স্যতে ॥"*

"যিনি আত্মার অভ্যন্তরে সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান পরমাত্মার সত্বা উপলব্ধি করেন, তাঁহার এই সংস্কার হয় যে, আমি এবং আমার অন্তরাত্মস্থিত সেই দেব একই। তবে তাঁহার নিকট হৃদয়ের কোন্ ভাব গোপন করিব, আমার আশঙ্কার বস্তুই বা কি আছে?"

রাজা বলিলেন "সত্য! এই ভেদজ্ঞানেই জীবের বিপদ, কিন্তু ইহা দূর করাও ত সহজ নয়।"

মহর্ষি বলিলেন, "তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু জীবাত্মাও ত সামান্য নয়; বিশ্বাত্মার অংশ, সুতরাং তন্নিবিষ্ট হইলে সকল জ্ঞানই তাহার লভ্য।" কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি বলিলেন, "রাজর্ষি! তোমার সহিত আলাপ করিতে বসিলে কথার ত শেষ হয় না। আমাকে অদ্যই উত্তরাপথে যাত্রা করিতে হইবে। আমি মহিষী এবং রাজকুমারীদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইব।"

রাজা বলিলেন; "তাঁহারা আপনার আগমন-সংবাদ পাইয়াছেন, এখনই আসিবেন।"

---

* ইহার অনুবাদ যথা :—

অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ হয়ে অতি সূক্ষ্ম তনু লয়ে,
আত্মার অন্তরে তিনি করেন বিরাজ;
তাঁহার শাসন-বলে চরাচরে সবে চলে,
ভূত, ভাবী, বর্ত্তমানে ব্রহ্মাণ্ডের মাঝ।
তাঁহার সত্তার জ্ঞান লভে যেই মতিমান্,
আত্ম-সংগোপনে তার বাসনা না হয়;
এই তার হয় মনে অভিন্নত দুই জনে,
কারে লুকাইব, আর কারেই বা ভয় ॥

পতিব্রতা-লেখক-কৃত কঠোপনিষদের কবিতানুবাদ হইতে উদ্ধৃত

রাজার কথা শেষ না হইতে হইতেই রাজমহিষী, দুহিতা সীতা-দেবী ও উর্ম্মিলাদেবীকে সঙ্গে লইয়া, গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজকুমারীদিগের রূপপ্রভায় হোমাগ্নিও যেন মলিন হইল। তাঁহাদিগের প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ হইতে যেন লাবণ্য নিঃসৃত হইতেছিল। বসন্ত-সমাগমে পুষ্পিতা লতার ন্যায় উভয়েই নব-যৌবন-সমাগমে শোভাময়ী; উভয়েরই মুখে বালিকার সরলতার সঙ্গে তরুণীর ব্রীড়া-সঙ্কুচিত ভাব বিরাজমান। মহিষী দুহিতৃগণের সঙ্গে প্রণাম করিলে মহর্ষি তাঁহাদিগকে নিকটে উপবেশন করিতে আদেশ দিলেন এবং বহুক্ষণ নির্নিমেষ নয়নে রাজকুমারীদিগের মুখ অবলোকন করিয়া মহিষীকে বলিলেন;—

"বৎসে! তোমাকে কি আশীর্ব্বাদ করিব তাহাই চিন্তা করিতেছি। তোমার স্বামী সাক্ষাৎ মহেশ্বরতুল্য; তুমি পার্ব্বতী-সদৃশী; তোমার কন্যা দুইটী লক্ষ্মী, সরস্বতীর অনুরূপা; আশীর্ব্বাদ করি, তোমার নারায়ণ সদৃশ জামাতা লাভ হউক।"

রাজা, রাণী একসঙ্গে বলিলেন, "আমরা এই আশীর্ব্বাদ বররূপে গ্রহণ করিলাম।"

পরে রাজা মহিষীকে বলিলেন, "প্রিয়ে! শুনিয়াছ, গুরুদেব আমাদিগের মায়া ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতেছেন।"

মহিষী। "নাথ! আমি সমস্তই শুনিয়াছি; আমার দাসী ক্ষেমাকে গতকল্য আশ্রমে পাঠাইয়াছিলাম, সে আসিয়া সমস্ত বলিয়াছে, এবং সেই সঙ্গে ইহাও বলিয়াছে, আর্য্যা মৈত্রেয়ী, আপনার উত্তরচ্ছদ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া, এক বসনে রহিয়াছেন।"

রাজা শুনিয়া বিস্ময় সহকারে বলিলেন; "গুরুদেব! ইহার কারণ কি?"

মহর্ষি। "কারণ বলিতেছি; আমি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের সঙ্কল্প

করিয়া কাত্যায়নী এবং মৈত্রেয়ী আমার পত্নীদ্বয়কে আহ্বান পূর্ব্বক নিজের অভিপ্রায় জানাইয়া বলিলাম, "আমার অনুপস্থিতিকালে কি জানি তোমাদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়, সেইজন্য আমি আমার সর্ব্বস্ব তোমাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিবার ইচ্ছা করিয়াছি। উভয়ে গ্রহণ কর।"

রাজা। "তাহার পর।"

মহর্ষি। "শুনিয়া কাত্যায়নী কোন উত্তর দিলেন না; কিন্তু মৈত্রেয়ী আমাকে বলিলেন; "প্রভো! আপনি আমাকে যাহা দিতে চাহিতেছেন, তাহা দ্বারা কি আমি অমরতা লাভ করিতে পারিব ?"

আমি বলিলাম "প্রিয়ে! পার্থিব বস্তু লইয়া কে কবে অমর হইতে পারিয়াছে ? আমি তোমাকে যাহা দিব, তাহা দ্বারা তোমার গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব দূর হইবে মাত্র, কিন্তু তাহার দ্বারা অমরতালাভের সম্ভাবনা কোথায় ?

রাজ্ঞী। "শুনিয়া আর্য্যা কি বলিলেন!"

মহর্ষি। "মৈত্রেয়ী শুনিয়া বলিলেন, "ভগবন্! আমার এই সকল বস্তুতে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আমি যাহার দ্বারা অমরতা লাভ করিতে পারি, আপনি আমাকে তাহাই দান করুন।"

এই বলিয়া তিনি আপনার অংশের সমস্ত সম্পত্তি ত্যাগ করিলেন এবং বিনীতা শিষ্যার ন্যায়, কৃতাঞ্জলিপুটে, আমার উপদেশ শ্রবণের জন্য, উপবেশন করিলেন। আমি তাঁহাকে শুদ্ধাচারা, ধীমতী ও সমাহিতচিত্তা জানিয়া ব্রহ্মবিদ্যা দান করিলাম। ইহাই তাঁহার সর্ব্বস্বত্যাগের ও এক বসন ধারণের কারণ।"

রাজকুমারীরা এতক্ষণ মহর্ষির সহিত মাতাপিতার কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিলেন, একটী মাত্রও উক্তি করেন নাই! এইবার

মহিষী। "শুনিয়াছি বৈ কি। এই পাপিষ্ঠা মহাতপোবিঘ্ন-কারিণী; ইহার ভয়ে শত শত ব্রহ্মচারিণী মিথিলায় গমনাগমন ত্যাগ করিয়াছেন।"

রাজা। "ইহারই অত্যাচারে মলদ ও করূষ নামক উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান দুইটী জনপদ লোকশূন্য হইয়াছে। স্ত্রীজাতি হইলেও তাহার দেহে মত্তহস্তিনীর ন্যায় বল। বৈধব্যের পর হইতে পাপিষ্ঠার অত্যাচার ও দুষ্প্রবৃত্তি আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে; শুনিতে পাই, যক্ষিণী হইয়াও, সে এখন রাক্ষসীর ন্যায় নরমাংস ভক্ষণ করে। তাহার একটী পুত্র আছে; সেও মাতার প্রকৃতি লাভ করিয়াছে। যেখানেই ঋষিগণ যজ্ঞ আরম্ভ করেন, পাপিষ্ঠ সেখানেই দলবল সহ উপস্থিত হয় এবং রক্ত. মাংস নিক্ষেপ করিয়া যজ্ঞ নষ্ট করে। কিন্তু আপনি রামচন্দ্রের কথা বলিতে বলিতে পাপিষ্ঠা তাড়কার কথা আনিলেন কেন?"

মহর্ষি। "কেন? বলিতেছি; রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, কয়েক দিন পূর্ব্বে, মিথিলাগমনের পথে তাড়কার গ্রামে প্রবেশ করিয়া-ছিলেন।"

মহর্ষি লক্ষ্য করিলেন, শুনিবামাত্র রাজকুমারীদ্বয়ের চক্ষুর তারকা স্থির ও ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইল। মহিষী ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন, "তাহার পর"।

মহর্ষি। "তাঁহাদিগের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণে তাড়কা, অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, শিলাখণ্ড বর্ষণ করিতে করিতে, তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া, রামচন্দ্রের দিকে ধাবমানা হইল! তাহার পরিধান চিত্র-ব্যাঘ্রের চর্ম্ম, কণ্ঠে নরকপালে গ্রথিতমালা, দেহে অস্থিভূষণ; তাহার কেশজাল তাম্রাভ এবং দেহ রুধিরপঙ্কে লিপ্ত। তাহার ভয়ঙ্করমূর্ত্তি দর্শনে সেখানে যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারা ভয়ে পলায়ন করিল।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাক্ষসীকে যুদ্ধকামা দেখিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন "বৎস! ইহাকে বধ কর"।

রামচন্দ্র শুনিয়া অবজ্ঞায় কেবলমাত্র বলিলেন, "ভগবন্! এ যে স্ত্রীজাতি।"

নিমেষমাত্রে তাঁহার নিক্ষিপ্ত শর রাক্ষসীর বক্ষোদেশ বিদীর্ণ করিল; সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসী, বিকট আর্ত্তনাদ করিতে করিতে, ভগ্ন গিরিশৃঙ্গের ন্যায়, ধরাতলে পতিত হইল। রামচন্দ্রের এমনই অব্যর্থ লক্ষ্য, তাঁহার বাহুতে এমনই অসাধারণ বল যে, তাঁহার শর দূরবর্ত্তিনী তাড়কার বিপুল দেহ ভেদ করিয়াও আমূল ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল।"

রাজমহিষী ও রাজকুমারীদ্বয় দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া যেন শান্তিবোধ করিলেন। মহিষী বলিলেন, "গুরুদেব! রামচন্দ্রের এই অপূর্ব্ব বীরত্ব-কাহিনী শ্রবণে আমাদিগের তৃপ্তি হইতেছে না, তাহার পর কি হইল?"

মহর্ষি। "তাহার পর রামচন্দ্র মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমে গমন করিলেন। আশ্রমস্থ ঋষিগণ সেখানে এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন। স্বভাবতঃ যজ্ঞদ্বেষী তাড়কাপুত্র মারীচ, এই সংবাদ পাইয়া, মাতৃহত্যার প্রতিহিংসাচরণের জন্য, আপনার বন্ধু সুবাহু নামক রাক্ষসপতির সঙ্গে, বিপুল রাক্ষস-বাহিনী লইয়া, তাম্রাভ সান্ধ্যমেঘের ন্যায়, যজ্ঞভূমি অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল। তাহারা যজ্ঞাগ্নি নির্ব্বাপণের জন্য চতুর্দ্দিক হইতে ধূলি, পাংশু ও প্রস্তর-খণ্ড নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং যজ্ঞবেদীর উপর মাংস ও শোণিত-বৃষ্টি আরম্ভ করিল। এক দিকে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, অপর দিকে বিপুল রাক্ষসদল; ঋষিগণ সন্ত্রস্ত হইলেন। কিন্তু সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে কুজ্ঝটিকা যেমন নিরাসিত হয়, তেমনি রামচন্দ্রের অমোঘ শরনিকরে

রাক্ষসসৈন্য অল্পক্ষণের মধ্যেই বিধ্বস্ত হইল। সুবাহু নিহত হইয়াছে, মারীচ ভগ্নজানু হইয়া পলায়ন করিয়াছে। দলপতিদিগের অবস্থা দেখিয়া অন্যান্য রাক্ষসগণ অরণ্যের মধ্যে যে কে কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই। মহর্ষিগণ, প্রীতমনে, যজ্ঞ সমাপন করিয়া, এক্ষণে, রামচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে দুর্ল্লভ দিব্যাস্ত্রসমূহ দান করিয়াছেন।"

রাজকুমারীদ্বয়ের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইল। কনিষ্ঠা রাজকুমারী ঊর্ম্মিলাদেবী জনককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবা! রামচন্দ্র মিথিলায় আসিবেন ত ?"

রাজা কন্যার প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝিলেন, ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "কেন মা ?"

ঊর্ম্মিলা। "তাহা হইলে তিনি একবার হরধনু পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন।"

রাজা, কন্যার কথার কোন উত্তর না দিয়া, মহর্ষিকে বলিলেন, "গুরুদেব! রামচন্দ্রে রজোগুণের পরিচয় ত যথেষ্ট পাইলাম; সত্ত্বগুণের কোন লক্ষণ আছে কি ?"

মহর্ষি। "রামচন্দ্রে রজোগুণের অপেক্ষা সত্ত্বগুণেরই প্রাধান্য; দুই একটী নিদর্শন বলিতেছি। একবার গঙ্গাস্নান উপলক্ষে শৃঙ্গবেরপুরাধিপতি চণ্ডালরাজ গুহকের সৈন্যের সহিত রাজা দশরথের সৈনিকদিগের মহান সংঘর্ষ হইয়াছিল। অপমানিত চণ্ডালদল, প্রাণপণ করিয়া, যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইয়াছিল; রঘুসৈনিকগণও রোষে ও ঘৃণায়, প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়, তাহাদিগকে দণ্ড দিবার জন্য ধাবমান হইয়াছিল। কিন্তু পাছে চণ্ডালকে স্পর্শ করিতে হয় এই ভয়ে, কিয়ৎকালের জন্য, যুদ্ধ স্থগিত ছিল। বালক রামচন্দ্র, শুনিতে পাইয়া, একাকী রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং অতি মধুর বাক্যে

উভয় দলকে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করিলেন। চণ্ডালরাজ গুহককে মিত্র সম্বোধনে সম্মানিত করিয়া তিনি আলিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিলেন। বৃষ্টিপাতে দাবাগ্নির ন্যায় প্রধূমিত যুদ্ধানল নির্ব্বাণ হইল।”

জনক। “রামচন্দ্র চণ্ডালরাজকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন?”

মহর্ষি। “হাঁ! বক্ষে বক্ষে মিলাইয়া নির্ভর আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। সেই হইতে দুর্দ্ধর্ষ চণ্ডালদল অযোধ্যারাজের দাসানুদাস হইয়াছে!”

মহিষী আনন্দগদ্গদ স্বরে বলিলেন, “সখী কৌশল্যা ধন্যা যে, এমন সুপুত্র গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন!”

মহর্ষি বলিলেন, “রামচন্দ্রের কীর্ত্তিকাহিনী এখনও শেষ হয় নাই, আরও বলিতেছি শুন। গৌতমপত্নী অহল্যা দীর্ঘকালাবধি মনস্তাপে ও আত্মগ্লানিতে ম্রিয়মানা হইয়াছিলেন। স্বামী, পুত্র কেহই তাঁহার সংবাদ রাখিতেন না, তিনিও কাহারও সংবাদ লইতেন না। নিজে অপমানিতা ও উপেক্ষিতা হইয়া তিনি স্নেহ-মমতা-শূন্য পাষাণের ন্যায় জীবনযাপন করিতেছিলেন। রামচন্দ্র, তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত ও বর্ত্তমান অবস্থা শুনিয়া, তাঁহার আশ্রমে গমন করিয়াছিলেন। মধুর মাতৃসম্বোধনে তিনি তাঁহার সকল মনস্তাপ দূর করিয়াছেন। বসন্তবায়ুস্পর্শে হিমপাতশীর্ণা লতার ন্যায় অহল্যা আবার সঞ্জীবিতা হইয়াছেন। মহর্ষি গৌতম তাঁহাকে আবার আদরে গ্রহণ করিয়াছেন, মরুভূমিতে অমৃতস্রোত প্রবাহিত হইতেছে।”

মহর্ষি, কথোপকথন কালে, জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী সীতাদেবীকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাড়কাবধ এবং রাক্ষসযুদ্ধ, গুহককে আলিঙ্গন-দান ও অহল্যা-উদ্ধার শ্রবণে তাঁহার মুখে, পর্য্যায়-ক্রমে, যে উদ্বেগ ও শান্তির, যে উল্লাস ও প্রীতির লক্ষণ সূচিত হইতেছিল, তাহা অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন। এ দিকে কথোপ-

কথনে বেলাও ক্রমে অধিক হইয়াছিল ; মহর্ষি রাজকুমারীদ্বয়কে বলিলেন, "বৎসে সীতে ! বৎসে উর্ম্মিলে! আজ আমি তোমাদের গৃহে আতিথ্য-গ্রহণ করিব। দীর্ঘকাল তোমাদিগের প্রস্তুত অন্ন, ব্যঞ্জন ভোজন করি নাই ; উভয়ে কেমন রন্ধন করিতে শিখিয়াছ, আজ দেখাও। কেবল রাজকন্যা সাজিয়া, হীরা, মুক্তা পরিয়া, থাকিলে হইবে না। স্বামী, পুত্রকে, অতিথি, অভ্যাগতকে অন্ন দিতে হইবে যেন স্মরণ থাকে।"

রাজকুমারীদ্বয়, লজ্জানম্রমুখে, মহর্ষির এবং মাতাপিতার চরণে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

তাঁহাদিগের প্রস্থানের পর মহর্ষি রাজমহিষীকে বলিলেন ; "বৎসে ! সীতার বিবাহ সম্বন্ধে তোমার নিকট আমার প্রতিশ্রুতি আমি বিস্মৃত হই নাই। আমার যাহা করণীয় তাহা আমি করিয়াছি। আমার প্রথম কার্য্য উপযুক্ত পাত্র-সংগ্রহ। মহর্ষি বিশ্বামিত্র আমার অনুরোধ-ক্রমে রামচন্দ্রকে লইয়া মিথিলায় আসিতেছেন। আমি রামচন্দ্রের বাহুবল সম্বন্ধে যাহা জানি, তাহাতে হরধনুর্ভঙ্গ তাঁহার নিকট বালকের ক্রীড়ামাত্র বলিয়া আমার বোধ হয়। তাঁহার কৃত-কার্য্যতা সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পার। তাহার পর আমার দ্বিতীয় কার্য্য সীতার হৃদয়-পরীক্ষা, তাহাও আমি করিয়াছি। তোমরা উভয়ে দেখিয়াছ কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়াছি। তাড়কা-বধ হইতে অহল্যা-উদ্ধার পর্য্যন্ত রামচন্দ্রের কার্য্য শ্রবণে সীতা মুগ্ধা ; আজ হইতে সীতার জীবন রামময় হইয়াছে ; রাম ভিন্ন আর কেহ তাহার হৃদয় অধিকার করিতে পারিবে না। আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে, আমি অদ্যই উত্তরাপথে যাত্রা করিব। তোমরা উভয়ে নিশ্চিন্ত মনে আমায় বিদায় দাও।"

মহর্ষি, ক্ষণকালের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া, পরে মহিষীকে বলিলেন; "বৎসে! একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, আমি সীতাকে যোগমার্গে যে শিক্ষা দিয়াছিলাম, তাহার ফল কি বুঝিতেছ?"

রাজ্ঞী। "প্রভো! আপনার প্রদত্ত উপদেশ কি কখনও নিষ্ফল হইতে পারে? সীতা, বালিকা হইলেও, যোগাভ্যাসে বয়োবৃদ্ধাদিগকে পরাজিতা করিয়াছে। চিত্তবৃত্তির নিরোধে সে যেমন পারদর্শিনী, বহিঃপ্রকৃতির উপরেও সে তেমনি শক্তিমতী। সমাধিস্থা হইলে পৃথিবীর সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে না। অগ্নি তখন তাহাকে দগ্ধ করিতে, বারি তখন তাহাকে সিক্ত করিতে, এবং বায়ু তখন তাহাকে চালিত করিতে পারে না। তাহার শক্তি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। অনিদ্রায়, অনাহারে, শীতাতপে কিছুতেই সীতা কাতরা নয়।"

মহর্ষি বলিলেন "উত্তম! সীতার শিক্ষা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের উপযুক্তই হইয়াছে।"

রাজ্ঞী। "প্রভো! আপনার কথার ভাবে বোধ হইতেছে সীতার ললাটে অনেক ক্লেশ আছে। সীতা কি সুখী হইতে, পারিবে না?"

মহর্ষি। "সে কথা জিজ্ঞাসা করিও না; এইমাত্র জানিও সীতার জন্ম নিজের সুখের জন্য নয়, নারীজাতির কল্যাণের জন্য। এই যে ধূপ দেখিতেছ, এ নিজে দগ্ধ হইয়াই গৃহ সৌরভপূর্ণ করিতেছে। সীতা নিজে দগ্ধ হইয়াই জগৎ পবিত্র করিবে। তোমরা যে এমন কন্যার জনক, জননী তজ্জন্য তোমরাও ধন্য হইবে।"

রাজদম্পতী ভক্তিভরে মহর্ষির চরণে প্রণাম করিলেন এবং আহারের জন্য তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মহর্ষির প্রস্থানের পর সপ্তাহ কাল অতীত হইয়াছে। রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত সীতার বিবাহ স্থিরীকৃত হইয়াছে। কেবল সীতার বিবাহ নয়; লক্ষ্মণের সহিত উর্ম্মিলার এবং জনকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজের কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির সহিত, যথাক্রমে, ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। দশরথ স্বজনবর্গ সহ মিথিলায় আগমন করিয়াছেন। মিথিলাপুরী উৎসবে পূর্ণ; পুরবাসীদিগের আনন্দের সীমা নাই। রাজকুমারীগণ রূপে, গুণে পৃথিবীতে অতুলনীয়া; তাঁহারা যে উপযুক্ত পাত্রে ন্যস্তা হইতেছেন এই ভাবিয়া মিথিলার আবালবৃদ্ধবনিতা পুলকিত হইয়াছে। লোকের মুখে অন্য কথা নাই, কেবলই রাজকুমারীদিগের বিবাহবার্ত্তা আলোচিত হইতেছে। হরধনুর্ভঙ্গই প্রধান আলোচনার বিষয়। প্রিয়দর্শন, সুকুমারতনু রামচন্দ্র কিরূপে সেই গুরুভার, দুর্জ্জয় ধনু উত্তোলন করিয়া ভগ্ন করিলেন, অনেকে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। কেহ বলিতেছে;—

"মহর্ষি বিশ্বামিত্র ইন্দ্রজাল জানেন, ইহা তাঁহারই কৌশল।"

কেহ বলিতেছে "না! আমাদিগের রাজর্ষি ইন্দ্রজালে মুগ্ধ হইবার ব্যক্তি নহেন। রামচন্দ্রকে দেখিয়া তাঁহাকে জামাতা করিবার জন্য রাজর্ষির বড় ইচ্ছা হইয়াছিল, অন্য কাহারও সম্বন্ধে সেরূপ ইচ্ছা হয় নাই। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির ইচ্ছা কখনও অপূর্ণ থাকিতে পারে না। তাই আমাদের রাজর্ষির পুণ্যবলে রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করিয়াছেন।"

অপর একজন বলিল, "যাহা স্বাভাবিক নিয়মে হয়, তাহায়

জন্য ইন্দ্রজাল, পুণ্যবল এ সকলের প্রয়োজন কি? রাজর্ষির ও রাজকুমারীর পুণ্যবলে যে রামচন্দ্রের ন্যায় পাত্রের সঙ্গে বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তোমরা যদি অনাবৃতদেহ রামচন্দ্রকে একবার দেখিতে তবে ইন্দ্রজাল, চন্দ্রজাল এ সকল কথা বলিতে না। সে দিন আমরা তাঁহাকে স্নানার্থ মন্দাকিনী-সরোবরে আসিতে দেখিয়াছিলাম। কি সুন্দর, সুগঠিত দেহ! পদের অঙ্গুষ্ঠ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত দেখিলে মনে হয়, যেন কোন নিপুণ শিল্পী একখানি নিকষ পাথর খুঁদিয়া মূর্ত্তি বাহির করিয়াছে। যেমন স্কন্ধ, তেমনই বক্ষ, তেমনই বাহু, তেমনি উরু! আমাদের অস্ত্রাচার্য্য ব্যূহভিৎ রামচন্দ্রকে দেখিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার শোত্তর বৎসর বয়সে ভারতের লক্ষাধিক প্রধান বীরপুরুষকে দেখিয়াছেন, কিন্তু কখনও এমন সর্ব্বাঙ্গসবল পুরুষ দেখেন নাই। স্নানান্তে রামচন্দ্র রাজপথ দিয়া যখন গমন করিতেছিলেন তখন মনে হইতেছিল, যেন শিশু ঐরাবত চলিয়াছে; পদভরে পথ যেন কম্পিত হইতেছিল। এমন পুরুষের পক্ষে ধনুর্ভঙ্গের জন্য কি ইন্দ্রজালের প্রয়োজন?"

মিথিলার নগরে, পল্লীতে, হাটে, ঘাটে, চত্বরে এইরূপ আলোচনা চলিতেছিল।

আজ বিবাহের দিন; সমগ্র মিথিলাপুরী আজ যেন এক মহা বিবাহ-সভায় পরিণত হইয়াছে। রাজা দশরথ এত অনুযাত্রী সহ আসিয়াছেন এবং রাজা জনকের এত আত্মীয়, কুটুম্ব উপস্থিত হইয়াছেন যে, বিশাল রাজপুরীতেও স্থান হইতেছে না। তাই পুরবাসিগণ নগরের নানা স্থানে বরযাত্রীদিগের উপবেশনের ও আহারের স্থান করিয়াছেন এবং রাজকুটুম্বদিগকে আত্মকুটুম্বের অপেক্ষা অধিক আদরে অভ্যর্থনা করিতেছেন। রাজপুরী হইতে

পরিচারকগণ খাদ্য ও পানীয়ের ভার লইয়া সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহাদিগের স্কন্ধস্থ পাত্র হইতে উচ্ছলিত দধি, দুগ্ধ ও ঘৃতে রাজপথ পিচ্ছিল হইয়াছে। শর্করা, মোদকলড্ডু ও পক্কান্নে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত হইয়াছে। নিমন্ত্রিতগণের মুখের কথা বাহির হইতে না হইতে পরিচারকগণ প্রয়োজনীয় দ্রব্য দান করিতেছে। বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীদিগের মধ্যে তর্ক, বিতর্ক বিবাহের অঙ্গ; এখানেও তাহার অভাব হইতেছে না। মিথিলা ও অযোধ্যা উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী অধিক প্রাচীন, সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ উভয়ের মধ্যে গুণগৌরবে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অগ্ন্যাধান প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম সঙ্গত কিনা এইরূপ নানা বিষয়ে তর্ক চলিতেছে। যুবজন উত্তেজনার সহিত নিজ নিজ মত সমর্থন করিতেছেন এবং বাহুবলে তাহার অকাট্যতা প্রদর্শনের প্রয়াস পাইতেছেন। প্রবীণগণ উভয় পক্ষকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিতেছেন। এইরূপে মিথিলানগরীর সর্ব্বত্র বিবাহের উৎসব চলিয়াছে।

রাজপুরী আলোক-মালায় সজ্জিতা। পত্র, পুষ্প, পল্লবে এবং চিত্র বিচিত্র পতাকায় তাহা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। পুরীর মধ্যস্থিত অঙ্গনে বহুমূল্য ঊর্ণা-নির্ম্মিত আসন প্রসারিত হইয়াছে। সপরিজন রাজা দশরথ তথায় উপবিষ্ট আছেন। সাধারণের স্থান হইতে স্বতন্ত্র আসনে বশিষ্ঠ, বামদেব, বিশ্বামিত্র, গৌতম, শতানন্দ প্রভৃতি ঋষিগণ উপবেশন করিয়াছেন। সুবেশা, সুরূপা নর্ত্তকীগণ নৃত্য এবং সুগায়কগণ মধুর সঙ্গীতালাপ করিতেছে। সভার মধ্য স্থলে পুষ্পদামে সজ্জিত মহামূল্য বরাসন; শ্রীরামচন্দ্র তথায় মনোহর বৈবাহিক বেশে আসীন। তাঁহার কণ্ঠে গজমুক্তার হার, কর্ণে হীরক-কুণ্ডল, বাহুতে রত্ন-খচিত অঙ্গদ, প্রকোষ্ঠে মণিময় বলয়। বিবাহ-সভাতেও ক্ষত্রিয়লক্ষণ ধনুর্ব্বাণ তাঁহার করে বিরাজিত রহিয়াছে।

তাঁহার ললাট শুভ্র চন্দনে চর্চ্চিত, শ্বেত পুষ্পমাল্য তাঁহার বক্ষোদেশে শোভা পাইতেছে। তাঁহার প্রশান্ত পবিত্র মূর্ত্তি বিবাহবেশে দ্বিগুণ সুন্দর দেখাইতেছে। দশরথ এবং জনক অনিমেষে তাঁহার মুখ দেখিতেছেন, তাঁহাদিগের তৃপ্তিবোধ হইতেছে না; আনন্দে তাঁহাদিগের বক্ষ স্ফীত হইতেছে। জ্যেষ্ঠানুক্রমে চারিভ্রাতার বিবাহ হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। প্রথমে রামচন্দ্রের বিবাহ আরম্ভ হইল। শুভলগ্নে উজ্জ্বল বসনভূষণে সজ্জিতা সীতাদেবী বিবাহমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। নারীকণ্ঠ-নিঃসৃত উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি এবং মঙ্গলবাদ্যে রাজপুরী ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সীতাদেবীকে দেখিয়া সভাস্থ ব্যক্তিগণের বোধ হইল যেন তাঁহারা মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীদেবীকে দর্শন করিলেন। চতুর্দ্দিকে চিত্রকুম্ভ, অঙ্কুর-সমন্বিত শরাব, ধূপপাত্র, শঙ্খপাত্র, স্রুব, স্রুক, অর্ঘ্য এবং লাজপূর্ণ পাত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত, কুশাচ্ছাদিত বেদীমধ্যে সীতাদেবী ও রামচন্দ্র পীঠোপরি উপবেশন করিলেন। স্বয়ং বশিষ্ঠদেব যে বিবাহের বিধানদাতা, তাহা যে কিরূপ সদাচারে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। রঘুকুলের ও জনককুলের পুরোহিতগণ বেদবিহিত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। রাজর্ষি জনক রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন; বৎস!

ইয়ং সীতা, মম সুতা, সহধর্ম্মচরী তব।
প্রতীচ্ছ চৈনাং, ভদ্রং তে, পাণিং গৃহ্ণীষ্ব পাণিনা॥*

রামচন্দ্র সীতাদেবীর কর করদ্বারা গ্রহণ করিলেন; উভয়ের শরীর কণ্টকিত হইল, অঙ্গুলি ঘর্ম্মে সিক্ত হইল। স্পর্শ-জনিত

* "এই আমার দুহিতা সীতা; ইনি অদ্য হইতে তোমার সহধর্ম্মচরী হইলেন। তুমি ইহাকে গ্রহণ কর, কর দ্বারা ইহার কর ধারণ কর, তোমার কল্যাণ হইক।"

সুখ যে কি অপূর্ব্ব উভয়ে তাহা এই প্রথম অনুভব করিলেন। রামচন্দ্র সীতাদেবীকে বলিলেন ;

বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা
মনশ্চ, হৃদয়ঞ্চ তে ;
যদেতৎ হৃদয়ং তব
তদস্তু হৃদয়ং মম ;
যদেতৎ হৃদয়ং মম
তদস্তু হৃদয়ং তব। *

বিধাতার আশীর্ব্বাদে এই মন্ত্র সুসিদ্ধ হইয়াছিল। পৃথিবীতে আর কোন বধূবরের হৃদয় এরূপ ভাবে একীভূত হয় নাই। সেই জন্যই উভয়ে, জীবনে, অন্যের অসহ্য দুঃখ সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

উভয়ের চারি চক্ষু মিলিত হইল, উভয়েই ভাবিলেন পৃথিবীর মধ্যে যাহা দর্শনীয় তাহা দেখিলাম ; এতদিনে চক্ষুষ্মত্তা সার্থক হইল। ক্রমে বিবাহ সুসম্পন্ন হইল। অন্যত্র বধূ আকাশে অরুন্ধতী দর্শন করেন, সীতাদেবী শরীরিণী অরুন্ধতীদেবীকে দেখিয়া কৃতার্থা হইলেন। রাজকুটুম্বিনীগণ একবাক্যে বলিলেন রূপে, গুণে, কুলে, শীলে সীতার উপযুক্ত বরই হইয়াছে বটে। শুনিয়া রাজমহিষীর আনন্দের সীমা রহিল না। রামচন্দ্রের বিবাহের পর ভরত, লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্নের বিবাহ যথাক্রমে মাণ্ডবী, ঊর্ম্মিলা এবং শ্রুতকীর্ত্তি দেবীর সহিত সম্পন্ন হইল। আত্মীয় স্বজন সকলেই পরিতোষলাভ

---

* সত্যরূপ গ্রন্থিদ্বারা আমি তোমার হৃদয় ও মনকে বন্ধন করিতেছি। তোমার যে এই হৃদয় তাহা আমার হউক এবং আমার এই যে হৃদয় তাহা তোমার হউক।

করিলেন ; সাধারণ লোক ভূরিভোজনে তৃপ্ত হইল। রাজা জনক কন্যা ও জামাতাদিগকে দাস, দাসী, সুবর্ণ, অশ্ব, গজ এবং ভূমি যৌতুক দিলেন। কয়েক দিন মিথিলায় অবস্থানের পর দশরথ পুত্র, পুত্রবধূদিগকে লইয়া আযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন। হরধনুর্ভঙ্গ-বার্ত্তা শ্রবণে কুপিত, ক্ষত্রিয়কুলান্তক পরশুরাম, অকাল জলদের ন্যায়, তাঁহার সুখসূর্য্য ক্ষণকালের জন্য আসিয়া আবৃত করিয়াছিলেন, কিন্তু রামচন্দ্রের বিক্রমে পরাজিত হইয়া তিনি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বাদ্যোদ্যমে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া দশরথ অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী প্রভৃতি রাজ-মহিষীগণ যে কি আনন্দে পুত্র ও পুত্রবধূদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন, তাহা বলিবার আবশ্যক করে না। চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ যেমন আদরে শাখাসমন্বিত ঋক, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিবেদকে গ্রহণ করেন, পুরবাসিগণও তেমনি বধূ-দ্বিতীয় রামচন্দ্র, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে আদরে গ্রহণ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সীতাদেবীর বিবাহের পর ক্রমে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়াছে। শরৎকালীন জ্যোৎস্না যেমন আকাশ উজ্জ্বল করে, সীতাদেবীর যৌবন-মনোজ্ঞ, পবিত্র মূর্ত্তি তেমনই অযোধ্যার রাজভবন উজ্জ্বল করিয়াছে। দশরথ এতদিন আত্মহারা হইয়া পুত্রদিগকে ভাল বাসিতেন, এখন পুত্রবধূগণ আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া লইয়াছেন। বধূদিগের মধ্যে প্রত্যেকের প্রতি অকপট স্নেহ থাকিলেও সীতাদেবী, নিজগুণে, সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার প্রিয়পাত্রী হইয়াছেন। রামচন্দ্রকে না দেখিলে বরং দশরথ থাকিতে পারেন,

বাসিতেন। দশরথ রামচন্দ্রের পিতা; কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী রামচন্দ্রের মাতা; ভরত, লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন রামচন্দ্রের ভ্রাতা; ইহাঁদিগকেত তিনি ভাল বাসিতেনই, কিন্তু সেই সঙ্গে অযোধ্যার প্রত্যেক নরনারীও তাঁহার ভালবাসার পাত্র ছিল। কারণ তাহারা রামচন্দ্রের প্রজা। তিনি জানিতেন পতিকুলের প্রত্যেককে ভাল না বাসিলে তাঁহার পতিপ্রেমের পূর্ণতা হইতে পারে না। কারণ ইঁহারাও তাঁহার পতির অঙ্গ। সীতাদেবী ভাবিতেন, ইঁহাদিগের সুখের জন্য এবং ইঁহাদিগের মনোরঞ্জনের জন্য তবে তিনি কোন্ ক্লেশ সহ্য করিতে, কোন্ সুখ বিসর্জ্জন দিতে পরাঙ্মুখী হইবেন? পৃথিবীতে যুগে যুগে সতী পতিকে ভাল বাসিয়া আসিতেছেন, কিন্তু সীতার ন্যায় আর কেহ পতির সঙ্গে পতিকুলকে ভাল বাসিতে পারেন নাই। তিনি যে অবনত মস্তকে নির্ব্বাসন-ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, তাহার মূল কারণ তাঁহার পতিভক্তি, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার পতির প্রজাদিগের প্রতি বাৎসল্যও অন্যতম কারণ বটে।

এক দিকে পতিকুল সম্বন্ধে এই অনুরাগ, অপর দিকে শৈশবার্জ্জিত সংস্কার সীতাদেবীর প্রকৃতি-গঠনে বিশিষ্টরূপ কার্য্য করিয়াছিল। রাজা জনক তাঁহাকে শিখাইয়াছিলেন, "সাংসারিক কার্য্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ লিপ্ত থাকিলেও কখনও ভগবৎপদারবিন্দ বিস্মৃত হইবে না।" পতিদেবতা সীতা এই উপদেশকে আদর্শ লইয়া ভাবিতেন, পতিকুলের সকলকেই প্রাণমনে ভালবাসিলেও, মুহূর্ত্তের জন্য, কখন পতিকে বিস্মৃত হইলে চলিবে না। প্রয়োজন হইলে তাঁহার জন্য সর্ব্বত্যাগিনী হইতে হইবে। সীতার মনের এই ভাবই, পরে, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, আত্মীয় সকলের মায়া ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে বনগমনোদ্যত পতির অনুগামিনী করিয়াছিল।

সীতাদেবীর জীবন এইরূপে পরম সুখে অতিবাহিত হইতেছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কিন্তু বিধাতার লীলা কে বুঝিতে পারে? যে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া সীতারূপ সুবর্ণের বিশুদ্ধি পরীক্ষা করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল, দিন দিন বিধাতা তাহার ইন্ধন সঞ্চয় করিতে-ছিলেন। অযোধ্যাপুরীর সকলেই রামচন্দ্রের ও সীতাদেবীর গুণে মুগ্ধ ছিলেন। কেবল এক জনের ঈর্ষাকলুষিত কুটিল দৃষ্টি সর্ব্বদা তাঁহাদিগের উপর পতিত হইত। সে কৈকেয়ীদেবীর পরিচারিকা, নাম মন্থরা। কৈকেয়ীদেবীর শৈশবে সে তাঁহাকে তাঁহার পিত্রালয়ে পালন করিয়াছিল এবং তাঁহার বিবাহের পর, অযোধ্যা পুরীতে আসিয়া তাঁহার নিকট বাস করিতেছিল। বিধাতা তাহাকে অতি কুরূপা ও বিকৃতাঙ্গী করিয়াছিলেন। তাহার শরীরের বর্ণ কৃষ্ণ, তাহার দন্তগুলি উচ্চ, ওষ্ঠাধর স্থূল, উদর লম্বিত, এবং পৃষ্ঠে প্রকাণ্ড কুঁজ। তাহাকে দেখিলেই লোকে হাস্য করিত; সে হাস্য তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা থাকিত। ভালবাসা না পাইলে ভাল বাসিতে প্রবৃত্তি হয় না। কাহারও ভালবাসা না পাইয়া এবং সকলের নিকট বিদ্রূপ ও উপহাস লাভ করিয়া মন্থরার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। কেবল দুইজনের সম্বন্ধে তাহার হৃদয়ের সরসতা নষ্ট হয় নাই। প্রথম কৈকেয়ী, দ্বিতীয় কৈকেয়ীপুত্র ভরত। ইহাঁদিগের মঙ্গলের জন্য দিবারাত্র তাহার হৃদয় স্নেহে বিগলিত থাকিত; ইঁহাদিগের সুখের জন্য সুকর্ম্ম, দুষ্কর্ম্ম এমন কিছুই ছিল না, মন্থরা যাহা করিতে কুণ্ঠিত হইত। রামচন্দ্রের ও সীতাদেবীর প্রতি তাহার প্রকৃত ক্রোধ ছিল না; তাহার আক্রোশ কৌশল্যাদেবীর উপর। কারণ তিনিই কৈকেয়ীর প্রতিদ্বন্দ্বিনী এবং মন্থরার বিবেচনায় তাঁহার প্রাধান্যের বিঘ্নরূপিণী। কৌশল্যার উপর আক্রোশ হইতে ক্রমে রামচন্দ্রের ও সীতাদেবীর উপরে তাহার আক্রোশ জন্মিয়া-

ছিল। মন্থরা ভাবিত, "কেকয়রাজ যে এমন বৃদ্ধ বরে আপনার সোণার প্রতিমা কন্যা দিয়াছিলেন সে কিসের জন্য? কৌশল্যা ও সুমিত্রার সন্তান হইবার আশা নাই; কৈকেয়ীর গর্ভে যে সন্তান হইবে সেই অযোধ্যা-রাজ্যের অধীশ্বর হইবে, এই আশায় ত বটে। কিন্তু তাহার কি হইল * বিধাতার এমনই বিড়ম্বনা যে কৈকেয়ীর সন্তান হইবার পূর্ব্বেই কৌশল্যার সন্তান হইল। জ্যেষ্ঠ পুত্রই ত রাজ্যের অধিকারী; তবে আমার কৈকেয়ীর এবং আমার ভরতের উপায় কি হইবে? হায়! হায়! কৈকেয়ী যে রূপে, গুণে অনুপমা; কি মুখ! কি চুল! কি গড়ন! তাহার রূপের সঙ্গে কি কৌশল্যার রূপের তুলনা হয়? আর গুণে কৈকেয়ীর তুল্যা কে? রাজা যখন অসুর-যুদ্ধে আহত হইয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছিলেন, তখন কে তাঁহার সেবা করিয়াছিল? দুষ্ট ব্রণে যখন তাঁহার প্রাণ যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন মুখ দিয়া ক্ষতের বিষ চুষিয়া লইয়া ছিল কে? আমার এমন লক্ষ্মী-প্রতিমা কৈকেয়ী কৌশল্যার মুখাপেক্ষিণী দাসী হইয়া থাকিবে? তাহা কথনই হইতে দিব না। কৈকেয়ী বড় নির্ব্বোধ, নিজের হিতাহিত বুঝে না, তাই সপত্নী কৌশল্যাকে ভালবাসে, তাহার পুত্র রামকে ভরত হইতেও অধিক স্নেহ করে। বড় লোকের বুদ্ধি কোন কালেই সূক্ষ্ম নয়; ভাল! কৈকেয়ী নিজে না বুঝিলেও আমিত তাহার ভাল, মন্দ বুঝিতে পারি; দেখি কি হয়! সুযোগ পাইলেই কৌশল্যার দাসীত্ব হইতে তাহাকে মুক্ত করিব।"

* কৈকেয়ী দশরথের মধ্যমা কি কনিষ্ঠা পত্নী তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। রামায়ণের প্রামাণিক টীকাকার রামানুজ "কৈকেয্যাপেক্ষয়া জ্যেষ্ঠত্বং কৌশল্যাপেক্ষয়া কনিষ্ঠত্বং" ইত্যাদি বাক্যে সুমিত্রা যে দশরথের মধ্যমা পত্নী ইহা ইঙ্গিত করিয়াছেন। আমি তাঁহার মতের অনুসরণ করিয়াছি।

মন্থরা সর্ব্বদা এইরূপ ভাবিত। ঘটনাক্রমে তাহার অভিলাষ পূর্ণ হইবার সুযোগ উপস্থিত হইল। রাজা দশরথ বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। আপনাকে রাজকার্য্যে অক্ষম দেখিয়া এবং জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে প্রাপ্তযৌবন, কার্য্যক্ষম এবং প্রজাপ্রিয় দেখিয়া তিনি তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ভরত এই সময়, বিশেষ কোন কার্য্য উপলক্ষে, মাতুলালয়ে গিয়াছিলেন; অন্য শুভদিন শীঘ্র না থাকায় রাজা, নিরুপায়ে, তাঁহার অনুপস্থিতি-কালেই, রামচন্দ্রের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার আদেশ দিলেন। অযোধ্যাপুরী আনন্দোৎসবে মগ্ন হইল। নৃত্য, গীত এবং বাদ্যোদ্যমে প্রজাগণ আপনাদিগের আনন্দ জ্ঞাপন করিতে লাগিল। পথ সকল পরিষ্কৃত এবং সুগন্ধিজলে সিক্ত হইল। দেবালয় সকল চূর্ণ দ্বারা ধবলিত এবং পুষ্পমাল্যে ভূষিত হইল। গৃহচূড় হইতে নানা বর্ণের পতাকা সকল উড্ডীন হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে বিচিত্র তোরণ এবং মঞ্চ সকল নির্ম্মিত হইল এবং গায়কগণ সেই সকল মঞ্চের উপর বসিয়া বেণু, বীণা, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সংযোগে সঙ্গীত করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ উচ্চৈঃস্বরে বেদগান করিতে লাগিলেন এবং রাজা ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া প্রার্থীদিগকে অন্ন, বস্ত্র ও ধন দান করিতে লাগিলেন। মন্থরা প্রথমে এই আনন্দোৎসবের কারণ জানিতে পারে নাই, পরে জানিতে পারিয়া ক্রোধে অন্ধা ও হিংসায় জর্জ্জরিতা হইল। সে নির্জ্জনে কৈকেয়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া কর্কশ স্বরে বলিল; "মূঢ়ে! নিশ্চিন্তা হইয়া আছ; কোন সংবাদ রাখনা?"

মন্থরার মুখে "মূঢ়া," "বুদ্ধিহীনা" ইত্যাদি উক্তি শ্রবণে কৈকেয়ী অভ্যস্তা ছিলেন; সুতরাং বিস্মিতা বা ধৈর্য্যচ্যুতা না হইয়া বলিলেন, "কি সংবাদ"?

মন্থরা বলিল; "রাজা কৌশল্যা-পুত্রকে যুবরাজপদে বরণ করিয়াছেন; নগরে অভিষেকোৎসব আরম্ভ হইয়াছে।"

কৈকেয়ী আপনার কণ্ঠ হইতে রত্নখচিত হার উন্মোচন পূর্ব্বক মন্থরাকে প্রদান করিয়া বলিলেন, "মন্থরে! তুমি আমায় যে সুসংবাদ দিলে এই তাহার পুরস্কার লও।"

মন্থরা ক্রোধে হার দূরে নিক্ষেপ করিয়া কর্কশস্বরে বলিল; "বুদ্ধিহীনে! এই যদি তোমার মনের ভাব তবে সন্তান গর্ভে ধরিয়াছিলে কেন?"

কৈকেয়ী বিস্মিতা হইলেন, বলিলেন "মন্থরে! তোমার এ সকল কথা বলিবার উদ্দেশ্য কি? কি হইয়াছে?"

মন্থরা। "কি হইবে? তোমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। তোমার সপত্নীপুত্র রাজা হইতেছে; আর তোমার পুত্র তাহার চামরধারী হইবে, রাজা তাহার আয়োজন করিতেছেন।"

কৈকেয়ী। "রাম ত আমার সঙ্গে সপত্নীপুত্রের মত ব্যবহার করে না। কৌশল্যারও অপেক্ষা সে আমায় শ্রদ্ধা করে, আর ভরতকে সেত প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসে। ভরত রাজা হইলেও আমার যেমন সুখ, রাম রাজা হইলেও তেমন।"

মন্থরা আপনার ললাটে করাঘাত করিয়া বলিল, "হায়! হায়! কেকয়রাজবংশ চিরকাল তেজস্বিতার জন্য প্রসিদ্ধ, সে বংশে যে এমন বুদ্ধিহীনা, এমন অধমা কন্যা জন্মিবে, তাহা কে জানিত? একবার তোমার মনে হইতেছে না. রাম রাজা হইলে, বৃদ্ধ রাজা যখন চক্ষু মুদিবেন, তখন, এক মুষ্টি অন্নের জন্য, তোমাকে কৌশল্যার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইবে? শৃগালী অন্য জন্তুর ভুক্তাবশেষ আহার করিয়া তৃপ্তিলাভ করে, কিন্তু সিংহী করে না। তুমি সিংহের কুলে শৃগালী জন্মিয়াছ।"

কৈকেয়ী শুনিয়া অনেকক্ষণ নীরব রহিলেন ; পরে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "এখন উপায় ?"

মন্থরা বুঝিল, ঔষধ ধরিয়াছে। গম্ভীরভাবে বলিল, "উপায় তোমারই হস্তে ; নিজে কৌশল্যার দাসীত্ব করিয়া সুখ পাও, দাসীত্ব কর, কিন্তু পুত্রকে আজীবন দাস করিয়া রাখিতে চাও কেন ?"

কৈকেয়ীর মুখ আরক্ত হইল, চক্ষু দুইটী উজ্জ্বল হইল। মন্থরার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "মন্থরে! আর বলিতে হইবে না, এখন উপায় কি বল ?"

মন্থরা। "উপায় না ভাবিয়া তোমার নিকট আসি নাই। এখন রামের পরিবর্ত্তে ভরতকে সিংহাসনে বসাইতে পারিলেই সকল বিপদ ঘুচিবে। স্মরণ আছে ত, তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া, রাজা তোমাকে দুইটী বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন ? তুমি প্রয়োজন মত সে দুইটী বর লইবে এই বলিয়াছিলে। এখন প্রথম বরে কৌশল্যাপুত্রের চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য নির্ব্বাসন এবং দ্বিতীয় বরে ভরতের জন্য রাজ্য প্রার্থনা কর। রাজা সত্যরক্ষার জন্য প্রাণ দিতে পারেন, কখনও নিজের প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করিবেন না।"

কৈকেয়ী নির্ব্বাক্ হইয়া মন্থরার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "মন্থরে! বুঝিলাম পৃথিবীতে তোমার মত আমার হিতৈষিণী কেহ নাই। কিন্তু রাগ করিও না, একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, ভরতের জন্য রাজ্য প্রার্থনা করিতে চাও কর, কিন্তু নিরপরাধ রামচন্দ্রকে নির্ব্বাসিত করিতে চাও কেন ?"

মন্থরা। "তোমার বুদ্ধি চিরদিনই সমান রহিল ; রাজার কন্যা, রাজার স্ত্রী হইয়াও রাজনীতি বুঝিতে শিখিলে না। রামকে নির্ব্বাসিত না করিলে ভরত যে একটী দিনেরও জন্য সুখে রাজত্ব করিতে পারিবে না। গুরু, পুরোহিত হইতে প্রজা, প্রতিবাসী,

সৈন্য, সেনাপতি সকলেই রামের গুণের পক্ষপাতী। রাম যদি ইঙ্গিত করে তবে অযোধ্যার লক্ষ লোক আসিয়া রাত্রির মধ্যে রাজপুরী অবরোধ করিয়া দাঁড়াইবে। সে অগ্নি নির্ব্বাণ করা ভরতের পক্ষে সহজ হইবে না; কিন্তু রাম নির্ব্বাসনে যাইলে সে আশঙ্কা থাকিবে না।”

কৈকেয়ী। “তবে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য নির্ব্বাসন কেন? চিরদিনের জন্য হইলেই ত আরও ভাল হয়।”

মন্থরা। “না! ওরূপ নিষ্ঠুর প্রার্থনা রাজা রক্ষা নাও করিতে পারেন। অধিক আকর্ষণে বন্ধন-রজ্জু ছিঁড়িয়া যায়, তাহা ত জান। আর চতুর্দ্দশ বৎসর নির্ব্বাসন নিতান্ত অল্প নয়। ইহার মধ্যে ভরত সকলকেই বশীভূত করিয়া লইতে পারিবে। এক দিনের কথা বলা যায় না, চতুর্দ্দশ বৎসরে রাম, সীতার অদৃষ্টে কি ঘটিবে কে বলিতে পারে?”

কৈকেয়ী। “সীতাকেও নির্ব্বাসন দিতে চাও না কি? সে যে ননীর পুতুল, নিশ্বাসের উত্তাপে গলিয়া যায়; নিজের শাশুড়ী অপেক্ষাও সে আমায় অধিক ভক্তি করে। নিরপরাধে তাকে নির্ব্বাসন দিতে চাও কেন? সে কথা আমি বলিতে পারিব না।”

মন্থরা হাসিয়া বলিল; “আমি তোমায় সে কথা একবার মুখেও আনিতে বলিতেছিনা। তুমি রামের নির্ব্বাসন চাও, তাহা হইলেই সব হইবে।”

কৈকেয়ী। “কিন্তু ভরত কি রাজ্য লইবে? রাম তাহার ইষ্টদেব, রামের অপ্রিয়কার্য্য সে কিছুতেই করিবে না। সে যদি বলে আমি রাজ্য চাই না, তখন কি হইবে?”

মন্থরা। “ভরত যদি জানে যে, পিতার আদেশ তখন সে কিছুতেই অসম্মত হইবে না। এই সূর্য্যবংশের সঙ্গে ব্যবহারে



সীতা, ১১৭ পৃষ্ঠা

একটী বড় সুবিধা আছে। ধর্ম্মের দোহাই দাও, শাস্ত্রের দোহাই দাও, ইহাদিগের আর মাথা উঠাইবার শক্তি থাকিবে না। তুমি ভরতকে বলিও, তোমার পিতা তোমায় এই রাজ্য দিয়াছেন, তাহার পর যাহা ফল হয় দেখিবে।”

কৈকেয়ী। “চতুর্দ্দশ বৎসর পরে ভরত যদি রামকে রাজ্য ফিরাইয়া দেয় তখন কি হইবে?”

মন্থরা। “সে কথা পরে হইবে। তোমার এই পালঙ্কের উপর শয়নে যাহার অভ্যাস হইয়াছে, সে কি কখন ভূমিতে শয়ন করিতে চায়? একবার রাজ্য-সুখ ভোগের পর ভোগ-শক্তি থাকিতে তাহা ত্যাগ করিতে ঋষি, তপস্বীরও ইচ্ছা হয় না, সাধারণ মানুষের ত দূরের কথা। আর যদি চতুর্দ্দশ বর্ষ রাজ্যভোগের পর ভরত নিতান্তই রামকে রাজ্য ছাড়িয়া দেয়, তবে জানিও বিধাতা সুখ-ভোগের জন্য ভরতকে সৃজন করেন নাই, তাহা হইলে তুমিই বা কি করিবে আর আমিই বা কি করিব?”

কৈকেয়ী। “বুঝিলাম! আর কিছু বুঝাইতে হইবে না; তোমার অই কুঁজের ভিতর যে এত বুদ্ধি তাহা জানিতাম না। এখন কি করিতে হইবে, বল।”

মন্থরা। আর কিছু করিতে হইবে না, অভিমান করিয়া বসিয়া থাক, রাজা সান্ত্বনা করিতে আসিলে অই দুইটী বর লইও। কিন্তু সাবধান! রাজার চক্ষুর জল দেখিয়া যেন গলিয়া যাইও না।”

কৈকেয়ী। “না না! আর বলিতে হইবে না, কৈকেয়ী কেমন মেয়ে এইবার দেখিবে।”

মন্থরা। “হাঁ! এ কথার যদি অন্যথা হয়, তবে জানিব তুমি কেকয়-রাজকুলের কন্যা নও।”

তাহার পর যাহা হইল, তাহার বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন

নাই। কৈকেয়ী মন্থরার পরামর্শে রাজার নিকট রামচন্দ্রের নির্ব্বাসন এবং ভরতের রাজপদ প্রার্থনা করিলেন। এরূপ বিপদ ঘটিবে দশরথ স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই; কৈকেয়ীর বাক্যে তিনি যেন বজ্রাহত হইলেন। প্রথমে মধুর বাক্যে, তাহার পর কৃতাঞ্জলিপুটে, এবং অবশেষে তাঁহার পদতলে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া, তিনি কৈকেয়ীকে এই নিষ্ঠুর বরপ্রার্থনা প্রত্যাহার করিতে বলিলেন। রামচন্দ্রের অভাবে তাঁহার প্রাণসংশয় হইবে, ইহাও পর্য্যন্ত জানাইলেন। ক্ষোভে ও রোষে তিনি কৈকেয়ীকে মর্ম্মভেদী তিরস্কার করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হইল না। মন্থরার মন্ত্রে দীক্ষিতা কৈকেয়ী পাষাণীর ন্যায় রাজাকে তাঁহার সত্য রক্ষার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং রঘুবংশের কোন রাজা কখনও সত্য হইতে বিচ্যুত হন নাই বারংবার এই কথা তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলেন। যে ক্ষীণাঙ্গী নির্ঝরিণী কোমলতায়, স্নিগ্ধতায় এবং কল কল সঙ্গীতে হৃদয়, মন শীতল করে, তাহাই আবার পর্ব্বতদেহ বিদীর্ণ করিয়া, উভয় কূল প্লাবিত করিয়া এবং তটতরু উন্মূলিত করিয়া সংহারিণী মূর্ত্তিতে ধাবিতা হয়। নারীহৃদয় স্বভাবতঃ কোমল এবং স্নেহপ্রবণ, কিন্তু যদি একবার তাহা প্রকৃতিচ্যুত হয়, তাহা হইলে তাহাও উন্মাদিনী গিরিনদীর আকার ধারণ করে; লজ্জা, ভয়, স্নেহ, দয়া কিছুই তাহার গতিরোধ করিতে পারে না। পুত্রের অমঙ্গল-চিন্তায় ভীতা এবং স্বার্থে অন্ধা কৈকেয়ী যখন কিছুতেই সঙ্কল্পচ্যুতা হইলেন না, তখন সত্যভঙ্গভয়ে রাজা দশরথ, অনন্যোপায় হইয়া, রামচন্দ্রকে বনপ্রেরণে সম্মত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অন্তঃপুরে, রজনীতে, কৈকেয়ী-ভবনে, যখন এই বজ্রগর্ভ মেঘের সঞ্চার হইতেছিল, কৌশল্যাদেবী, রামচন্দ্র বা সীতাদেবী কেহই তখন সেই ঘটনার বিন্দুমাত্রও অবগত ছিলেন না। কৌশল্যাদেবী, পুত্রের মঙ্গলের জন্য, দেবারাধনা ও দীন, দরিদ্রকে অর্থ দান করিতেছিলেন। রামচন্দ্র ও সীতাদেবী, আপনাদিগের ভাবী দায়িত্ব অনুভব করিয়া, শুদ্ধ ও সংযত চিত্তে নিশাযাপনান্তে, কতক্ষণে পিতার নিকট হইতে অভিষেকের আদেশ আসিবে তজ্জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রজাগণ, সমস্ত রাত্রি উৎসবে অতিবাহন করিয়া, প্রভাত না হইতে হইতে, অভিষেক দর্শনের জন্য, দলে দলে, রাজপুরীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল। রাজসভা লোকে পরিপূর্ণ; নিমন্ত্রিত ঋষিগণ, রাজগণ ও রাজকুটুম্বগণ আপন আপন স্থানে উপবেশন করিয়াছেন। অভিষেক-মণ্ডপে তীর্থোদক, তীর্থমৃত্তিকা, ঘৃত, মধু, দধি, প্রবাল, কাঞ্চন প্রভৃতি অভিষেক-সামগ্রী সজ্জিত হইয়াছে। মৃগচর্ম্মাস্তীর্ণ, স্বর্ণখচিত ভদ্রাসন এবং তাহার পার্শ্বে শ্বেত চামর ও শ্বেতচ্ছত্র শোভা পাইতেছে। সুসজ্জিত শ্বেত বৃষভ, শ্বেতবর্ণ অশ্ব এবং সুলক্ষণাক্রান্ত হস্তী দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছে। সামগায়ী ব্রাহ্মণগণ, পলাশকাষ্ঠে যজ্ঞাগ্নি উদ্দীপন করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে গান আরম্ভ করিয়াছেন। কতক্ষণে রাজা, রামচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া, অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিবেন তজ্জন্য সকলেই উৎসুক চিত্তে অপেক্ষা করিতেছেন। বেলা ক্রমে প্রহরাতীত এবং অভিষেক-কাল অতিক্রান্তপ্রায় হইল দেখিয়া বশিষ্ঠদেব সুমন্ত্রকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। তিনি কৈকেয়ীর ভবনে যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার আর

বাঙ্‌নিষ্পত্তির শক্তি রহিল না। তিনি দেখিলেন রাজা দশরথ ভূতলে পতিত আছেন। অনবরত রোদনে তাঁহার চক্ষু দুইটী আরক্ত ও তাঁহার ললাটের শিরা স্ফীত হইয়াছে; বক্ষে ও ললাটে বারম্বার আঘাত করাতে সেই সকল স্থান লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার অঙ্গের বসন বিস্রস্ত এবং তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া অনবরত অশ্রুধারা বহিতেছে। অদ্বিতীয় প্রতাপশালী প্রভুর এই অবস্থা দেখিয়া সুমন্ত্র স্তম্ভিত হইলেন। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার সাহস হইল না। দশরথ তাঁহাকে দেখিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন, "সুমন্ত্র! একবার আমার রামকে এখানে লইয়া এস।"

সুমন্ত্র "যে আজ্ঞা" বলিয়া বিদায় লইলেন। রামচন্দ্র পিতার আদেশ শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণাৎ সুমন্ত্রের সঙ্গে কৈকেয়ীর ভবনে উপস্থিত হইলেন এবং সুমন্ত্র তাঁহাকে যে অবস্থায় দেখিয়া গিয়াছিলেন সেই অবস্থায় বর্ত্তমান দেখিলেন। বিষাদে এবং বিস্ময়ে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। তিনি পিতার ও বিমাতার চরণে প্রণাম করিয়া করপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দশরথের শোকসিন্ধু যেন উচ্ছসিত হইয়া উঠিল। তিনি একবার মাত্র বলিলেন "রাম"! আর কিছু বলিবার তাঁহার শক্তি হইল না, বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া আপনার স্বাভাবিক মধুর স্বরে কৈকেয়ীকে বলিলেন, "মা"!

যে নারীর বক্ষে একবার ক্ষীর সঞ্চার হইয়াছে এবং সন্তানকে স্তন্যদানের সময় যিনি একবার তাহার আধো আধো কথা শ্রবণ করিয়াছেন, "মা" কথার ন্যায় আর কিছুই তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত করিতে পারে না। "মা" এই মধুর আহ্বানে কৈকেয়ীর পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হইল।

রামচন্দ্র তাঁহাকে পুনর্ব্বার বলিলেন "মা! বাবা আজ এরূপ অবস্থায় কেন? কোন স্থান হইতে কি কোন দুঃসংবাদ আসিয়াছে? ভরত, শত্রুঘ্ন ভাল আছে ত? আপনার পিত্রালয়ের ত কুশল!"

কৈকেয়ী বলিলেন, "রাম! সকলেরই কুশল! তোমার পিতা তোমারই জন্য এত কাতর হইয়াছেন!"

রাম। "আমারই জন্য! কি করিতে হইবে বলুন; পৃথিবীতে এমন কিছুই নাই তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য আমি যাহা করিতে না পারি।"

কৈকেয়ী। "তুমি সূর্য্যবংশের তিলক। তোমার পিতার জন্য তোমাকে একটু ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে। পারিবে ত?"

রাম। "মা! আপনি ওরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? পিতার আদিষ্ট কোন কার্য্যই আমার নিকট ক্লেশকর বোধ হইবে না। পিতা যদি আদেশ করেন, এই মুহূর্ত্তে আমি ধন, জন, রাজ্য, এমন কি নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারি।"

কৈকেয়ী বিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন; বলিলেন; "রাম! তুমি চিরজীবী হও; প্রাণত্যাগের কথা বলিতেছ কেন? অল্পদিন কিছু ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে মাত্র। তোমার পিতা আমাকে দুইটী বর দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, আমি একটী বরে তোমার চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাস এবং অপর বরে ভরতের রাজ্যলাভ প্রার্থনা করিয়াছি। সত্যব্রত রাজা আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিশ্রুতিরূপ ঋণ-মোচনের ভার এক্ষণে তোমার হস্তে।"

এই মর্ম্মভেদী সংবাদে রামচন্দ্রের মনের ভাব কিরূপ হয় কৈকেয়ী তাহা লক্ষ্য করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন তাঁহার মুখশ্রী

বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তিত হইল না। রামচন্দ্র পূর্ব্ববৎ প্রসন্ন মুখে, পূর্ব্ববৎ মধুর বচনে, বলিলেন;

"মা! আজ আমি ধন্য হইলাম! একদিকে পিতার সত্যমোচন, অপরদিকে আপনার পরিতোষ, এবং সেই সঙ্গে প্রাণাধিক ভরতের রাজ্যলাভ এই তিনই আমার প্রিয়। আপনি পিতাকে নিশ্চিন্ত হইতে বলুন, তাঁহার আদেশ আমি শিরোধার্য্য করিলাম।"

গুণের পক্ষপাতী নয় কে? রামচন্দ্রের ব্যবহারে কৈকেয়ী মুগ্ধা হইলেন; ক্ষণকালের জন্য তাঁহার মনে হইল, হায়! আমি এ কি করিতেছি! এমন ধার্ম্মিক, সুশীল সন্তানকে ক্লেশ দিতেছি! কিন্তু সেই সঙ্গে ভরতের ভাবী উপজীবিত্ব, কৌশল্যার প্রাধান্য এবং সর্ব্বোপরি মন্থরার গঞ্জনা তাঁহার মনে হইল। তিনি অবিচলিত ভাবে বলিলেন;

"রাম! তোমার ব্যবহারে পরম প্রীত হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, যেন চিরদিনই তোমার এইরূপ ধর্ম্মে মতি থাকে। কিন্তু তোমাকে অদ্যই বনগমন করিতে হইবে; তুমি না যাইলে ভরত অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিতে পারিবে না।"

রাম। "আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাই হইবে। আমি অদ্যই বনগমন করিব। পিতার ও আপনার চরণে প্রণাম করিয়া জননীর ও সীতার নিকট হইতে বিদায়গ্রহণের মাত্র আমার অপেক্ষা।"

রামচন্দ্র এই বলিয়া দশরথের ও কৈকেয়ীর চরণে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। দশরথের বাঙ্‌নিষ্পত্তির শক্তি ছিল না; তিনি কেবল উদাসনয়নে রামচন্দ্রকে দেখিতে ছিলেন। দুই একবার "রাম রাম" উচ্চারণ করিয়া তিনি ধরাশায়ী হইলেন। এদিকে রামচন্দ্র যেখানে কৌশল্যাদেবী দেবালয়ে তাঁহার জন্য পূজা দিতেছিলেন

সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। কি বলিয়া তিনি পুত্রগতপ্রাণা জননীর নিকট বিদায় লইয়াছিলেন, মর্ম্মপীড়িতা কৌশল্যাই বা কি বলিয়া তাঁহার নিকট আপনার নিদারুণ বেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা বিস্তারিত বলিবার প্রয়োজন নাই। এইমাত্র বলিলেই হইবে যে, বক্ষ হইতে সবলে হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করিলে শরীরী জীবের যে যন্ত্রণা হয়, কৌশল্যা সেই যন্ত্রণা অনুভব করিলেন। তিনি আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলেন, কৈকেয়ীকে এবং রাজাকে তিরস্কার করিলেন, রামচন্দ্রকে বনগমনে নিষেধ করিলেন এবং পুত্রের বিশাল বক্ষস্থলে আপনার মস্তক রাখিয়া শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র তাঁহাকে তদবস্থায় যাহা বলা কর্ত্তব্য তাহা বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন। কিন্তু কৌশল্যার হৃদয় প্রবোধ মানিল না। তপ্ত অশ্রুধারায় এবং দীর্ঘশ্বাসে তিনি তাঁহার বেদনা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণের পর, অবশেষে, তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া এবং কোনরূপে তাঁহার বিদায়-আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া যেখানে সরলহৃদয়া সীতাদেবী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, রামচন্দ্র তথায় গমন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এইবার আমরা সীতারামের কথোপকথন সর্ব্বপ্রথম শ্রবণ করিব। এতদিন আমরা দেখিয়াছি, মেঘান্তর্হিতা সৌদামিনীর ন্যায় সীতাদেবীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই; রামরূপ মেঘে সীতা সৌদামিনীর সত্তা লুপ্ত হইয়া আছে। কিন্তু মেঘ যে বিদ্যুৎ নয় এবং বিদ্যুৎ যে মেঘ নয়, অবস্থা বিশেষে বিদ্যুৎ যে আপনাকে প্রকাশিত করে, এইবার আমরা তাহা দেখিতে পাইব। সীতাদেবী রামচন্দ্রের

প্রত্যাগমনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে একাকী, এরূপ ভাবে, প্রত্যাগত দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল। মুহূর্ত্ত পরে যিনি অযোধ্যার যুবরাজপদে অভিষিক্ত হইবেন, তিনি এরূপ নিঃসঙ্গ কেন? স্বভাবতঃ গম্ভীরপ্রকৃতি হইলেও এবং বাহ্য-লক্ষণে যাহাতে তাঁহার মনোগত বেদনা প্রকাশিত না হয় তজ্জন্য যত্নবান হইলেও সীতাদেবীর দৃষ্টি হইতে নিজের মানসিক ভাব গোপন করা রামচন্দ্রের সাধ্য ছিল না। তাঁহাকে দেখিয়া সীতাদেবী আপনার স্বাভাবিক সপ্রেম, মধুর বাক্যে বলিলেন;—

"নাথ! আপনাকে এরূপ ভাবে একাকী প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে। আজ আপনার অভিষেকের দিন, ছত্র ও চামরধারিগণ আপনার অনুসরণ করিবে, সূত, মাগধগণ আপনার জয়গান করিবে, দিব্যরথ ও হস্তী আপনার জন্য অপেক্ষা করিবে, পুরবাসিগণ আপনাকে দেখিবামাত্র জয়ধ্বনি করিতে থাকিবে, না আপনি, সাধারণ জনের ন্যায়, নিঃশব্দে, পদব্রজে আগমন করিলেন, ইহার কারণ কি বলুন। আপনার আকার প্রকার দেখিয়া আমার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেছে। আর্য্য মহারাজ কুশলে আছেন ত?

রামচন্দ্র বলিলেন, "প্রিয়ে! আর্য্য কুশলে আছেন। অন্য কোন অহিত চিন্তার কারণ নাই। আর্য্যা বিমাতার অনুরোধে পিতা আমার অভিষেক স্থগিত রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।"

সীতাদেবী বিস্ময় সহকারে বলিলেন "সে কি? অকস্মাৎ এরূপ আদেশ দিলেন কেন?"

তখন রামচন্দ্র আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন; "প্রিয়ে! বিধাতার লীলা কে বুঝিতে পারে? দুঃখের সঙ্গে সুখ এবং সুখের সঙ্গে দুঃখ তিনি এরূপ ভাবে মিশ্রিত করিয়া

রাখিয়াছেন যে, কেহই নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ প্রাপ্ত হয় না। আমরা এত দিন কেবল সুখই ভোগ করিয়া আসিতেছিলাম, এইবার দুঃখের পর্য্যায় আসিয়াছে। তুমি ব্যাকুলা হইও না, পৃথিবীর প্রত্যেক নরনারী যে নিয়মের বশবর্ত্তী, আমাদিগের সম্বন্ধে তাহার অন্যথা হইবে, এ আশা করা সঙ্গত নয়।

সীতা। "নাথ! আমি বিন্দুমাত্র ও ব্যাকুলা হই নাই, আপনি যাহা সহ্য করিতে পারিবেন, দুর্ব্বলা নারী হইলেও, আমি তাহা সহ্য করিতে অক্ষমা হইব না।"

রামচন্দ্র। "উত্তম! পিতার আদেশে আমাকে অদ্যই অযোধ্যা ত্যাগ করিতে হইবে। আমি তাঁহার নিকট ও মাতা ঠাকুরাণীর নিকট বিদায় লইয়া আসিয়াছি, এক্ষণে তুমি আমায় সহাস্যমুখে বিদায় দাও।"

সীতা। "নাথ! আপনি কি আমার সঙ্গে রহস্য করিতেছেন? নচেৎ আমার নিকট হইতে বিদায়ের কথা বলিবেন কেন? সুখে, দুঃখে, সম্পদে বিপদে, গৃহে অরণ্যে, সর্ব্বাবস্থায় এবং সর্ব্বত্র, আপনার সহচরীত্ব করিবার জন্যই পিতা আমাকে আপনার হস্তে দান করিয়াছেন। আপনি যদি অরণ্যে গমন করেন, তবে কোন্ সুখের প্রলোভনে আমি রাজভবনে বাস করিব?"

রাম। "প্রিয়ে! সুখভোগের জন্য নয়; তুমি দুঃখে অনভ্যস্তা; স্বভাবতঃ কোমলাঙ্গী; অরণ্যবাসের ক্লেশ তোমার সহ্য হইবে না, সেইজন্যই তোমাকে রাজভবনে থাকিতে হইবে।"

সীতা। "নাথ! দাসীর অপরাধ গ্রহণ করিবেন না! পুরুষ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইলেও নারীর হৃদয় বুঝিতে পারেন না! গৃহে হউক আর অরণ্যে হউক, পতির সঙ্গে বাস যে নারী ক্লেশকর বলিয়া মনে করে, সে পত্নী নামের অযোগ্যা এবং নারীকুলে অধমা। আপনি দাসীকে কি এই অধমা বলিয়া মনে করেন?

রাম। "প্রিয়ে! তুমি এখনও বালিকা! বন যে কি ভয়ঙ্কর স্থান তোমার তাহা জ্ঞান নাই, সেই জন্যই তুমি বনগমনে সাহস করিতেছ। সিংহ, ব্যাঘ্রাদি দুরন্ত শ্বাপদগণ নিরন্তর বনে পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহাদিগের গর্জ্জন শ্রবণ করিলে বীরপুরুষদিগেরও হৃদয়ে আতঙ্ক হয়। বিশালশৃঙ্গ মহিষকুল, রক্তচক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া, তথায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে এবং মদমত্ত মাতঙ্গদল, দেহের ঘর্ষণে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ভগ্ন করিয়া, সেখানে সর্ব্বপ্রাণীর ভীতি উৎপাদন করিতেছে। তালবৃক্ষের ন্যায় সুদীর্ঘকায় অজগর সমূহ তথায় শয়ন করিয়া আছে; যে কোন প্রাণীই হউক, একবার তাহাদিগের সম্মুখে পতিত হইলে তাহার রক্ষা নাই। ঘন-সন্নিবিষ্ট তরুলতায় দিবসেও সেখানে নিবিড় অন্ধকার, খদ্যোতের আলোকে মাত্র পথ নির্ণয় করিতে হয়। ঝিল্লীর অবিরাম বিরাবে, পেচকের সুতীব্র ঘুৎকারে, এবং বৃক্ষকোটরস্থিত তক্ষকের গম্ভীর শব্দে সেখানে কর্ণ বধির হয়। বৃশ্চিক, দংশ ও মশকের উৎপাতে মুহূর্ত্তকাল স্থির থাকিতে পারা যায় না। কোনরূপ সুমিষ্ট আহার্য্য দ্রব্য সেখানে সুলভ নয়; যদৃচ্ছালব্ধ কটু, কষায় ফল এবং শুষ্কপত্রসংস্পৃষ্ট অপেয় বারি দ্বারা সেখানে জীবনযাপন করিতে হয়। ইহার উপর আর্য্যজাতির পরম শত্রু রাক্ষসগণ তথায় সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে। তাহারা স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর ও মায়াবী, সুযোগ পাইলেই নানাবিধ উপায়ে সজ্জনদিগের অনিষ্ট সাধন করে। এরূপ স্থানে বাস পুরুষের পক্ষেও দুঃসাহসিকতার কার্য্য, তুমি নারী হইয়া কিরূপে সেখানে যাইতে সাহস করিতেছ বুঝিতে পারিতেছি না।"

সীতা। নাথ! "দাসী কোন দিন আপনার কথার প্রতিবাদ করে নাই, কিন্তু আজ যখন আপনি তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে চাহিতেছেন, তখন আপনার নিকট মনের কথা না বলিলে

সে আপনারই নিকট অপরাধী হইবে। তাই দুই একটী কথা বলিতেছি, শুনুন। নারী পুরুষের ন্যায় শারীরিক ক্লেশে অভ্যস্তা নয়, নারী দুর্ব্বলা, এ সকল কথা সত্য। কিন্তু পতির সঙ্গে নারী যে পাষাণীর ন্যায় অবিচলিত হইয়া অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিতে পারে, পতির সঙ্গে ভীষণ অরণ্য যে তাহার নিকট নন্দনকাননের অপেক্ষাও মনোরম বোধ হয়, তাহাও কি সত্য নয়? আপনি যদি কটু, কষায় ফলমূল ভোজন করিয়া, দংশ, মশকের উৎপাত সহ্য করিয়া, অরণ্যে বাস করিতে পারেন, তবে কি সীতা পারিবে না? আর সিংহ, ব্যাঘ্র, মহিষ, মাতঙ্গের ভয় কাহার? যে নারীর স্বামী কাপুরুষ, আপনার পত্নীকে রক্ষা করিতে অক্ষম, তাহার। আপনি রাক্ষসের কথা বলিতেছেন, কিন্তু সীতা বীর্য্যশুল্কা; সীতা হরধনুর্ভঞ্জকের পত্নী; দেবতা হউন আর রাক্ষস হউক, সীতাকে যে অপবিত্র চিত্তে স্পর্শ করিবে, তাহার অব্যাহতি হইবে না। নাথ! আপনি নিবারণ করিবেন না, আমি নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে বনগমন করিব।"

রামচন্দ্র অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন, পরে বলিলেন "প্রিয়ে! তুমি এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর, আমি কিছুতেই তোমার বনগমনে সম্মতি দিতে পারিব না।"

সীতাদেবী, এইবার, অভিমানভরে, রামচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিলেন; তাঁহার নয়নপল্লব দুটী আর্দ্র হইল। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন; প্রভো! সীতা কোন দিন আপনার নিকট কোন প্রার্থনা করে নাই, এই তাহার প্রথম প্রার্থনা, আপনি তাহাকে নিরাশ করিবেন না। সীতার কোন অপরাধের জন্য যদি আপনি তাহাকে ত্যাগ করিতে চান, তবে সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু সীতা বনবাস-ক্লেশ সহ্য করিতে পারিবে না ইহাই যদি তাহাকে সঙ্গে না লইবার কারণ হয়, তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

পিত্রালয়ে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ আমাকে দেখিয়া অনেকবার বলিয়াছেন যে, আমার অদৃষ্টে অরণ্যবাস আছে। মাতার আদেশে আমি, সেই-জন্য, নিজেকে সর্ব্বপ্রকার ক্লেশে অভ্যস্তা করিয়াছি। অনশন, অর্দ্ধাশন, কুশাসনে শয়ন, চীর পরিধান কিছুতেই আমার ক্লেশ হইবে না। আপনি পরীক্ষা করিয়া দেখুন, সীতা কত ক্লেশ সহ্য করিতে পারে। অথবা ক্লেশের কথাই বা বলি কেন? আপনার সেবা করিতে পাইলে কোন ক্লেশই আমার নিকট ক্লেশ বলিয়া বোধ হইবে না। রাজভবনে সহস্র পরিজনের মধ্যে আপনার পরিচর্য্যা করিবার আমার সুযোগ হয় নাই। অরণ্যে যেখানে অপর কেহ আপনার সেবার জন্য থাকিবে না, বড় সাধ, সেখানে প্রাণ ভরিয়া আপনার সেবা করিব। আপনি অরণ্যে যাহা কিছু সংগ্রহ করিবেন, আমি তাহা স্বহস্তে আপনার জন্য রন্ধন করিব; নবীন দূর্ব্বাদল, কোমল পল্লব সংগ্রহ করিয়া আমি আপনার জন্য শয্যা রচনা করিব; নদী হইতে আমি আপনার পাদপ্রক্ষালনের জন্য জল আনিয়া দিব; উত্তপ্ত বালুকাপথে ভ্রমনের পর, শ্রান্ত হইয়া, আপনি যে স্থানে উপবেশন করিবেন, জল সিঞ্চন করিয়া, আমি তাহা স্নিগ্ধ করিব এবং অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া যাহাতে আপনার পদে বেদনা না লাগে তজ্জন্য পথের কুশ, কঙ্কর মর্দ্দন করিয়া যাইব। ভাবিয়া দেখুন, যখন আমার মনে হইবে যে, অরণ্যে আপনার সেবার জন্য একজনও নিকটে নাই, আর আমি দাস, দাসী পরিবৃতা হইয়া আছি, তখন আমার মনের কি অবস্থা হইবে।”

বলিতে বলিতে সীতাদেবীর স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, চক্ষু দুইটী জলে পূর্ণ হইল। তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন, অবনতজানু হইয়া উভয় হস্তে রামচন্দ্রের পদযুগল ধারণ করিলেন; করিয়া বলিলেন, “নাথ! আপনার সঙ্গে থাকিলে সীতা সকল ক্লেশ সহ্য

করিতে পারিবে, কিন্তু আপনার অভাবে জীবনধারণের তাহার শক্তি থাকিবে না। রোগে হউক, অনলে হউক, গরলে হউক, তাহার জীবন শেষ হইবে।"

সীতাদেবীর আর বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। রামচন্দ্র তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন এবং বলিলেন "প্রিয়ে! অন্তরাত্মা জানেন যে, সীতা ভিন্ন রামের জীবনে সুখ, শান্তি নাই। তবে যে তোমাকে গৃহে রাখিয়া যাইতে চাহিতেছিলাম, সে কেবল তোমারই মঙ্গলের জন্য। কিন্তু বুঝিতেছি তাহা হইবে না, এক্ষণে প্রস্তুত হও। আমাদিগের যাহা কিছু আছে, বিপন্ন, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ ও পরিজনদিগের মধ্যে বিতরণ কর। গুরুজনদিগের নিকট বিদায় লইয়া এস; আমি লক্ষ্মণের নিকট বিদায় লইয়া বনগমনের জন্য প্রস্তুত হই।"

সীতাদেবী এই কথা শ্রবণমাত্র দ্রুতপদে কৌশল্যাদেবীর ভবনের দিকে ধাবমানা হইলেন। কৌশল্যাদেবী যখন তাঁহার বনগমন-সঙ্কল্প অবগত হইলেন, তখন তাঁহার বিদীর্ণ হৃদয় যেন আরও বিদারিত হইল। কিন্তু পুত্র যে সাধ্বী পুত্রবধূর সেবা হইতে বঞ্চিত হইবেন না এই ভাবিয়া সেই যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিলেন। তিনি পুত্রবধূকে তৎকালোচিত উপদেশ দিলেন। সীতাদেবী, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, অন্য দুই শ্বশ্রূর ও দশরথের নিকট বিদায় লইলেন। প্রাচীনা রাজকুটুম্বিনীগণ রামচন্দ্রের বনগমন-সংবাদে কোনরূপে ধৈর্য্য রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোমলাঙ্গী তরুণী বধূ সীতা তাঁহার অনুগমন করিবেন শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কেহ কৈকেয়ীকে ধিক্কার দিতে, কেহ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে রাজভবন ক্রন্দন-কোলাহলে পূর্ণ হইল।

এদিকে রামচন্দ্র লক্ষ্মণের নিকট বিদায় লইতে গিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ পূর্ব্বেই সমস্ত কথা শুনিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহাকে নূতন কিছু বলিতে হইল না। ক্ষোভে এবং রোষে লক্ষ্মণের শরীর কম্পিত হইতেছিল, চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ হইয়াছিল, ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় তিনি ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন। তিনি রামচন্দ্রকে দেখিয়া বলিলেন; "আর্য্য! আপনি কৈকেয়ীপুত্রের জন্য রাজ্যত্যাগ করিতেছেন কেন?"

রামচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিলেন, "পিতার আদেশ।"

লক্ষ্মণ। "পিতা বার্দ্ধক্যে, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য; পিতা স্ত্রীবাধ্য; তাঁহার আদেশ পালনীয় নয়।"

রামচন্দ্র। "লক্ষ্মণ! আমি তোমার নিকট পিতৃনিন্দা শ্রবণ করিতে আসি নাই। পিতা আমাদিগের দেবতা; তিনি যে সত্য রক্ষার জন্য আমাকে বনপ্রেরণ করিতেছেন, ইহাতে তাঁহার প্রকৃত দেবোচিত গুণই প্রকাশ পাইতেছে। তুমি তাঁহার নিন্দা করিয়া পাপভাগী হইও না; ধার্ম্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভরতকে কৈকেয়ীপুত্র বলিয়া অবজ্ঞা করিও না। আমার কথা শুন। আমি মাতাপিতা সকলের নিকট বিদায় লইয়া আসিয়াছি, এক্ষণে তুমি হৃষ্টচিত্তে আমাকে বিদায় দাও"।

লক্ষ্মণ। "জীবন থাকিতে লক্ষ্মণ আপনাকে বিদায় দিতে পারিবে না; তাহার মৃত দেহ পদদলিত না করিয়া আপনি অযোধ্যার তোরণ অতিক্রম করিতে পারিবেন না।"

রামচন্দ্র। "ভাই! অবোধের মত কথা বলিও না। মনুষ্য নিজের নিজের কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করে। আমি আত্মকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে যাইতেছি; তুমি কেন বৃথা আমার সঙ্গে ক্লেশ ভোগ করিবে? তুমি গৃহে থাকিয়া মাতা, পিতার,

সেবা কর; তোমাকে দেখিলে তাঁহারা আমার অভাব কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইবেন। পুত্রের পক্ষে মাতাপিতার সেবা অপেক্ষা আর ধর্ম্ম নাই।"

লক্ষ্মণ। "দাদা! কোন দিন আপনার কথার অন্যথা করি নাই, কিন্তু আজ করিব। লক্ষ্মণের মাতা নাই, পিতা নাই, ইষ্টদেব নাই, আপনি তাহার সব। আপনার সেবাই তাহার ধর্ম্ম, অন্য ধর্ম্মে তাহার প্রত্যয় নাই। সঙ্গে লইয়া না যান, আপনি পুরদ্বার ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই এই শর তাহার হৃদয়ের শোণিত পান করিবে।"

লক্ষ্মণ এই বলিয়া আপনার করস্থিত ধনুতে বাণ যোজনা করিলেন। রামচন্দ্র তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, "ভাই! বুঝিয়াছি রামের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই; সীতা ও লক্ষ্মণ লইয়াই রাম। যাও, তবে গুরুজনদিগের নিকট বিদায় লইয়া এস; বনবাসের উপযোগী অস্ত্র, শস্ত্র সঙ্গে লইয়া প্রস্তুত হও। অবিলম্বে আমাদিগকে অযোধ্যা ত্যাগ করিতে হইবে।"

লক্ষ্মণ "যে আজ্ঞা" বলিয়া রামচন্দ্রকে প্রণাম করিলেন। তখন উভয় ভ্রাতা এক সঙ্গে সুমিত্রার নিকট গমন করিলেন। সুমিত্রা পূর্ব্বেই সীতাদেবীর নিকট সমস্ত অবগত হইয়াছিলেন, তিনি রামচন্দ্রকে বলিলেন "রাম! লক্ষ্মণ আমার নয়, লক্ষ্মণ তোমার; তাহার প্রতি যাহা কর্ত্তব্য করিও।" পরে লক্ষ্মণকে বলিলেন, "লক্ষ্মণ! তোমায় আর কি বলিব? রামকে তোমার পিতা হইতে এবং সীতাকে আমা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিও। এমন ভাবে চলিও, যেন, যুগ যুগান্তে লোকে বলে 'লক্ষ্মণের মত ভাই।" দুইজনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

তাহার পর যাহা হইল তাহা বর্ণন করিবার প্রয়োজন নাই। দশরথ, কৌশল্যা, সুমিত্রা ও উর্ম্মিলাকে অকূল শোকসাগরে নিক্ষেপ করিয়া, অযোধ্যাপুরী অন্ধকার করিয়া, রামচন্দ্র, সীতাদেবী

ও লক্ষ্মণ অরণ্যযাত্রা করিলেন। প্রহরমাত্র পূর্ব্বে যে অযোধ্যা উৎসবানন্দে পূর্ণ ছিল, তাহা গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইল। দশরথ উন্মত্তের ন্যায় তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন, এবং পুরবাসিগণ, সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইলেন। রামচন্দ্র যথোচিত মধুর বাক্যে সকলকে সান্ত্বনা দিয়া নিরস্ত করিলেন। পিতার আদেশে তিনি কিয়দ্দূর রথারোহণে গমন করিয়াছিলেন; অযোধ্যার সীমা অতিক্রম করিয়া রথ ত্যাগ করিলেন, এবং প্রিয় সুহৃদ গুহকের সাহায্যে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া, মহর্ষি ভরদ্বাজের উপদেশক্রমে, চিত্রকূট পর্ব্বতে যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যে দশরথ একদণ্ডও রামচন্দ্র ও সীতাদেবীকে না দেখিলে অস্থির হইতেন, রামচন্দ্রের অযোধ্যাত্যাগের পর তাঁহার অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা বলিবার অপেক্ষা করে না। তিনি রাজকার্য্য, অন্ন, জল, বিশ্রাম, নিদ্রা সমস্তই ত্যাগ করিলেন, এবং অবশেষে ভগ্নহৃদয়ে রামচন্দ্রের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। একে রামচন্দ্রের বনবাস, তাহার উপর দশরথের মৃত্যু, অযোধ্যাপুরী যেন শ্মশানে পরিণত হইল। রাজ্য অরাজক দেখিয়া মন্ত্রিগণ দূত প্রেরণ পূর্ব্বক ভরত, শত্রুঘ্নকে মাতুলালয় হইতে আনয়ন করিলেন। ভরত আসিয়া অযোধ্যার যে অবস্থা দর্শন করিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় স্তম্ভিত হইল। সেই নৃত্য-গীত-মুখরিত, বেদগানপ্রতিধ্বনিত, জনকোলাহলপূর্ণ পুরী নীরব হইয়াছিল। রাজপথ জনশূন্য, বিপণীসমূহ পরিত্যক্ত, এবং গৃহসমূহের

দ্বার ও বাতায়ন রুদ্ধ হইয়াছিল। গভীর শোকের ছায়া অমানিশার ন্যায় পুরী আবৃত করিয়াছিল। দিবসেও সেখানে পেচকদল, সৌধ-শিরে উপবিষ্ট হইয়া, চীৎকার করিতেছিল এবং শৃগালদল রাজপথে সুখে বিচরণ করিতেছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ভরত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নির্ব্বাসন, পিতার মৃত্যু, সমস্তই তাঁহার মাতার আচরণের ফল বুঝিয়া, ধার্ম্মিক ভরত ক্ষোভে ও লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইলেন। মন্থরা যাহা আশা করে নাই, কিন্তু কৈকেয়ী যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। ভরত কিছুতেই রাজ্যগ্রহণে সম্মত হইলেন না। "তোমার পিতা তোমাকে রাজ্য দিয়া গিয়াছেন" কৈকেয়ী এ কথা বারংবার বলিলেও তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইল না। তিনি বলিলেন, "এ রাজ্য পিতার স্বেচ্ছাদত্ত নয়, ইহা অধর্ম্মার্জ্জিত সুতরাং আমি ইহা গ্রহণ করিতে পারিব না।" তিনি পিতার ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া পুরবাসী ও পরিজনদিগের সঙ্গে রামচন্দ্রের অন্বেষণে যাত্রা করিলেন এবং বহু পর্য্যটনের পর চিত্রকূটে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন। রামচন্দ্র, চিত্রকূটে, তাপস-যোগ্য পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া, সীতাদেবী ও লক্ষ্মণের সহিত বাস করিতেছিলেন। তাঁহার পরিধান বৃক্ষের বল্কল, মস্তকের কেশ জটাবদ্ধ, সর্ব্বশরীর বিভূতিলিপ্ত। তাঁহাকে তদবস্থায় দর্শন করিয়া পুরবাসীদিগের চক্ষু জলে পূর্ণ হইল। ভরত, রামচন্দ্রের চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া, পিতার মৃত্যু ও অযোধ্যাপুরীর অবস্থা বর্ণন করিলেন, এবং তাঁহাকে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া রাজ্যভার গ্রহণের জন্য, কাতর ভাবে, অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র ব্যথিত হৃদয়ে পিতার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু পিতার সত্য-ভঙ্গ হইবার আশঙ্কায় কিছুতেই অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তনে ও রাজ্যভার গ্রহণে সম্মত হইলেন না। অবশেষে এই স্থির হইল যে, রামচন্দ্রের

পাদুকা সিংহাসনে স্থাপন করিয়া, ভরত স্থাপ্য সম্পত্তিরূপে রাজ্য-শাসন করিবেন। চতুর্দ্দশ বৎসর অন্তে রামচন্দ্র পুনর্ব্বার তাহা গ্রহণ করিবেন। মহামতি ভরত, তখন, রামচন্দ্রের পাদুকা শিরে বহন করিয়া, অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিন্তু অযোধ্যায় বাস তাঁহার পক্ষে অসহ্য ক্লেশকর হইল। চতুর্দ্দিকে রামচন্দ্রের স্মৃতি-চিহ্ন বর্ত্তমান। রাজপুরীর যে সকল প্রকোষ্ঠে তাঁহারা চারি ভ্রাতায় শয়ন, অধ্যয়ন, উপবেশন এবং ভোজন করিতেন, যে উদ্যানে অপরাহ্নে সকলে এক সঙ্গে পরিভ্রমণ করিতেন, যে তরুতলে ক্রীড়াচ্ছলে রামচন্দ্রকে রাজারূপে শিলা-সিংহাসনে বসাইয়া অপর তিন ভ্রাতার মধ্যে কেহ ছত্র ধারণ, কেহ চামর ব্যজন করিতেন, তাহা তেমনি বর্ত্তমান ছিল। অগ্নিশিখার ন্যায় এই সকল ভরতের নেত্র দগ্ধ করিত। অন্তঃপুরের যে ভবনে রামচন্দ্র সীতাদেবীর সহিত সুখে বাস করিতেন, উন্মুক্তদ্বার এবং শূন্য অবস্থায় যেন তাহা তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিত। তিনি অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া নন্দীগ্রামে রাজধানী স্থাপন করিলেন এবং তথায় রত্নময় সিংহাসনে রামচন্দ্রের পাদুকা স্থাপনপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের পাদুকা তাঁহার নিয়ন্তা ও প্রভুস্থানীয় হইল। দুরূহ রাজকার্য্য সম্বন্ধে তিনি পাদুকার নিকট আপনার বক্তব্য জানাইতেন, কেহ কোন উপহার দিলে তাহা অগ্রে পাদুকার নিকট নিবেদন করিয়া পরে ভাণ্ডারে রাখিবার আদেশ দিতেন। রামচন্দ্র, পিতার আদেশে, যে ভাবে, অরণ্যে জীবনযাপন্ করিতেছিলেন, তিনি, স্বেচ্ছায়, সেইভাবে, রাজভবনে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। তিনি রামচন্দ্রের ন্যায় বল্কল পরিধান এবং জটা ধারণ করিলেন। তাঁহার ন্যায় ফলমূল মাত্র ভোজনে তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী যেমন শুদ্ধ ও সংযতচিত্তে ইষ্টদেবের দর্শনের জন্য তপশ্চর্য্যা করেন,

ভরতও, তেমনি, রামচন্দ্রের দর্শনের জন্য, মহা তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। রাজভবনের সুখ সম্পদ, যৌবনের ভোগ-লালসা, পতিপ্রাণা তরুণী পত্নীর প্রেম ও সৌন্দর্য্য, কিছুই তাঁহার তপস্যার ব্যাঘাত করিতে পারিল না। ভ্রাতৃপ্রেমের অনুরোধে আত্ম-সংযমের এরূপ আদর্শ পৃথিবীর অপর কোন জাতির কেহ প্রদর্শন করিতে পারিয়াছেন কি না বলিতে পারি না; কিন্তু জানি না কোন্ পাপে আমরা এখন এ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতেছি!!!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অযোধ্যা ছাড়িয়া, পাঠক! আসুন, আমরা পুনর্ব্বার সীতাদেবীর ও রামচন্দ্রের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করি। ভরতকে বিদায় দিয়া রামচন্দ্র ভাবিলেন যে, চিত্রকূট অযোধ্যা হইতে অধিক দূরে নয়। তিনি সেখানে থাকিলে অযোধ্যাবাসিগণ, মধ্যে মধ্যে, তাঁহাকে দেখিতে আসিবেন এবং স্নেহবশতঃ কেহ কেহ তথায় বাস করিতেও পারেন; সুতরাং জনসংসর্গে পিতার উদ্দেশ্য বনবাস সিদ্ধ হইবে না। সেইজন্য তিনি অযোধ্যা হইতে দূরবর্ত্তী কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া বাস করিতে সঙ্কল্প করিলেন। বহু স্থান ভ্রমণের পর জনস্থানমধ্যবর্ত্তী, গোদাবরীতীরস্থিত পঞ্চবটী তাঁহার ও সীতাদেবীর মনোনীত হইল। লক্ষ্মণ, রামচন্দ্রের আদেশ ক্রমে, তথায় কয়েকখানি সুন্দর পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহাদিগের গৃহের অদূরে বহুযোজনব্যাপী দণ্ডকারণ্য নিরন্তর সুস্নিগ্ধ শ্যামশোভা বিকাশ করিত। প্রত্যেক ঋতু-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাহা নব নব বেশে সুশোভিত হইত। বসন্তাগমে তাহা শ্যামল কিশলয়ে এবং বর্ষাগমে তাহা কূটজ ও কদম্বকুসুমে

অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিত। দূরস্থিত গিরিরাজী, অচল মেঘশ্রেণীর ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া, তাঁহাদিগের নয়ন স্নিগ্ধ করিত এবং উপলঘাতিনী গোদাবরীর অবিরাম কল কল নিনাদে তাঁহাদিগের কর্ণ নিরন্তর তৃপ্ত হইত। পঞ্চবটী দর্শন করিয়া সীতাদেবী পরম পরিতোষ লাভ করিলেন; অযোধ্যাপুরীর সুখস্মৃতি তাঁহার চিত্ত হইতে ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে লাগিল।

পঞ্চবটীতে সীতাদেবী নূতনভাবে সংসার-ধর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। গ্রহবৈগুণ্যে তিনি অযোধ্যারাজ্য হারাইয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে দণ্ডকারণ্যকে রাজ্য এবং দণ্ডকাবাসীদিগকে প্রজারূপে প্রাপ্ত হইলেন। কুসুমভারনত ব্রততীসমূহ, তাঁহার কুটীরের চতুর্দ্দিকে বিরাজিত থাকিয়া, রাজভবনের রত্নখচিত সজ্জাকেও পরাজিত করিত। বনবৈতালিক পিকবর মধুর প্রাভাতিক সঙ্গীতে প্রতিদিন তাঁহাকে নিদ্রা হইতে উদ্বোধিত করিত এবং বননর্ত্তক ময়ূরদল তাঁহার দ্বারে আসিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিত। স্বচ্ছতোয়া সরসী তাঁহার দর্পণ এবং কুবলয় তাঁহার শিরোভূষণ হইল। রামচন্দ্র স্বহস্তে কুসুম চয়ন করিয়া তাঁহাকে পুষ্পাভরণে সজ্জিতা করিতেন। তিনি রাজেন্দ্রাণীর ন্যায় মুক্তহস্তে কত বিহগশিশুকে এবং কত কুরঙ্গশাবককে আহার দিতেন। দণ্ডকা যাঁহার ভাণ্ডার এবং লক্ষ্মণ যাঁহার পরিচারক তাঁহার অভাব কি? বনচারী সন্ন্যাসী এবং অতিথিদিগের জন্য তাঁহার সদাব্রতের দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। অরণ্যজ তরুলতাদিগকে পুত্রকন্যা স্থানীয় করিয়া তিনি তাহাদিগের বিবাহ দিতেন। তাঁহার স্নেহপালিতা লতাবধূ কুসুমিতা হইলে তাঁহার আনন্দোৎসব হইত। পুষ্পিত তরুকুঞ্জে, জ্যোৎস্নাধৌত নদীতটে এবং ছায়াস্নিগ্ধ অধিত্যকাভূমিতে রামচন্দ্রের সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া তিনি যে আনন্দ অনুভব করিতেন, পৃথিবীর

কোনও রাজমহিষীর ভাগ্যে তাহা সুলভ নয়। দণ্ডকার অবিদূরে মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রম বর্ত্তমান ছিল। তাঁহার পত্নী লোপামুদ্রাদেবী, মধ্যে মধ্যে, সীতাদেবীর কুটীরে আসিয়া, তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেন। পিতৃগৃহে সীতাদেবী যে তপশ্চর্য্যায় উপদিষ্টা হইয়াছিলেন, অরণ্যবাসকালের সাধনায় তাহার সম্যক্ পরিণতি হইল। রাজদুহিতা ও রাজবধূ হইয়াও তিনি আজন্মঅরণ্যপালিতার ন্যায় সুখে দিন অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু সুখভোগের জন্য সীতাদেবীর জন্ম হয় নাই। তাঁহার সুখচন্দ্রমাকে গ্রাস করিবার জন্য অকস্মাৎ রাহুর উদয় হইল। তাঁহারা যেখানে বাস করিতেছিলেন, তাহার নিকটবর্ত্তী প্রদেশ পর্য্যন্ত লঙ্কাধিপতি রাক্ষসরাজ রাবণের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। রাক্ষসরাজের অনুচরগণ সর্ব্বদা এই সকল প্রদেশে বিচরণ করিত। রামচন্দ্রের দণ্ডকায় আগমনের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে রাবণের কনিষ্ঠা ভগিনী শূর্পণখা পরিজনগণ সহ তথায় বাস করিতেছিল। শূর্পণখা বালবিধবা; যৌবনের চাঞ্চল্য ও লালসা তাহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। রামচন্দ্রের বীরোচিত মূর্ত্তি দর্শনে শূর্পণখা মোহিতা হইল, এবং, জাতিগত পার্থক্য বিস্মৃতা হইয়া, রামচন্দ্রকে পতিরূপে লাভের জন্য ব্যাকুলা হইয়া উঠিল। শূর্পণখা ভাবিল, সীতাদেবীই তাহার রামচন্দ্রের সহিত মিলনের পথের অন্তরায়। সেই জন্য সে, সুযোগ বুঝিয়া, একদিন, সীতাদেবীকে বধ করিতে উদ্যতা হইল। নিত্যসতর্ক লক্ষ্মণ, জানিতে পারিয়া, তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, তাহার নাসা ও কর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন। শূর্পণখার অনুচরগণ তখন রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে আক্রমণ করিল, কিন্তু দাবানলে যেমন শুষ্কপত্রসমূহ দগ্ধ হইয়া যায়, রামচন্দ্রের শরানলে তাহারাও তেমনই ভস্মীভূত হইল। অপমা-

নিতা, জিঘাংসাপরায়ণা শূর্পণখা যাইয়া সহোদর রাবণকে রাজসভামধ্যে আপনার দুর্দ্দশা জ্ঞাপন করিল। বালবিধবা দুঃখিনী ভগ্নীর অপমানে রাবণের হৃদয় স্বভাবতই ব্যথিত হইল; তাহার উপর রাবণ আপনাকে পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় বীর বলিয়া দম্ভ করিত। তাহার ঐশ্বর্য্যের এবং সৈন্যবলের সীমা ছিল না; সুতরাং নিজের প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য শূর্পণখার অপমানের প্রতিবিধান অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া তাহার বিবেচনা হইল। ইহার উপর তাহাকে উত্তেজিত করিবার জন্য শূর্পণখা একটী কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল। বলে ও কৌশলে পত্নীগ্রহণ রাক্ষসদিগের চিরাভ্যস্ত; শূর্পণখা, তাহা জানিয়া, আপনার পাপ উদ্দেশ্য গোপন করিয়া, এইরূপ প্রচার করিয়াছিল যে, অনুপমা সুন্দরী সীতাদেবীকে, দিগ্বিজয়ী, বীর ভ্রাতার যোগ্যা পত্নীবোধে, আনয়নের চেষ্টাতেই তাহার তাদৃশ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। সুতরাং রামচন্দ্রকে শাস্তিদানের সঙ্গে সীতাদেবীকে হস্তগতা করিবার ইচ্ছাও রাবণের বলবতী হইল। জনশ্রুতি বহুপূর্ব্ব হইতেই সীতাদেবীর অতুল সৌন্দর্য্যের সংবাদ তাহার নিকট আনয়ন করিয়াছিল। এক্ষণে কি উপায়ে নিজের উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে রাবণ তাহা চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইল। অল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা যে রামচন্দ্রকে শাস্তি দিবার সম্ভাবনা ছিল না, শূর্পণখার অনুযাত্রিগণের পরাজয়েই তাহা প্রমাণিত হইয়াছিল। রামচন্দ্র যেখানে বাস করিতেছিলেন তাহা প্রবলপ্রতাপ বানররাজ বালীর রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ। অধিক সৈন্য সহ সেখানে গমন করিলে বালীর সৈন্যের সহিত সংঘর্ষ হইতে পারে; কিন্তু মহাবীর বালীর সঙ্গে অকারণে বিরোধ প্রার্থনীয় নয়। একা যাইয়া পরশুরামজয়ী, হরধনুর্ভঙ্গকারী রামচন্দ্রকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করাও অতিসাহসিকতার কার্য্য। সুতরাং সসৈন্য হউক আর একাই হউক,

রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া সঙ্গত বলিয়া তাহার বোধ হইল না। বিশেষতঃ রামচন্দ্রকে বধ করিলে সীতাদেবী যদি ক্ষোভে আত্মহত্যা করেন, তাহা হইলে ত সকলই নিষ্ফল হইবে; সুতরাং যুদ্ধ অপেক্ষা কৌশলে সীতাদেবীকে হরণ ও ক্রমে তাঁহাকে বশীকরণ রাবণের নিকট নিরাপদ ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। এই উপায় দ্বারা নিজের লালসাতৃপ্তি এবং রামচন্দ্রকে লাঞ্ছনাদান উভয়ই হইবে। রাক্ষসদিগের মধ্যে কে তাহাকে এই কার্য্যে সাহায্য করিতে পারে তাহা চিন্তা করিতে করিতে তাড়কাপুত্র মারীচের কথা রাবণের স্মরণ হইল। মাতৃহন্তাকে দণ্ডদানে মারীচ আনন্দের সহিত সাহায্য করিবে এই ভাবিয়া রাক্ষসরাজ তাহার নিকট আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। কিন্তু রামচন্দ্রের পরাক্রম মারীচের অবিদিত ছিল না। সে, নানাপ্রকার যুক্তি দেখাইয়া, রাক্ষসরাজকে তাহার পাপ সঙ্কল্প হইতে বিরত হইতে পরামর্শ দিল। কিন্তু নিশ্চিৎ-মৃত্যু রোগী যেমন চিকিৎসকের কথায় কর্ণপাত করে না, রাবণও তেমনি মারীচের বাক্যে কর্ণপাত করিল না। অবশেষে স্থির হইল যে, মারীচ কোনরূপ কৌশলে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে সীতাদেবীর নিকট হইতে দূরে লইয়া যাইবে এবং সেই সুযোগে রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করিয়া রথারোহণে প্রস্থান করিবে। এইরূপ স্থির হইলে মারীচ, শোভন মৃগবেশে প্রচ্ছন্ন হইয়া, যেখানে রামচন্দ্র ও সীতাদেবী উপবিষ্ট ছিলেন, তাহার অবিদূরে উপবনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সীতাদেবী গুল্মাবরণে প্রচ্ছন্ন মারীচকে প্রকৃত মৃগ ভ্রম করিয়া এবং তাহার সুন্দর আকৃতি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া রামচন্দ্রের নিকট তাহাকে ধৃত করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। রামচন্দ্র, লক্ষ্মণের উপর সীতা-দেবীর রক্ষার ভার দিয়া, ধনুর্ব্বাণহস্তে কল্পিত মৃগের পশ্চাতে

ধাবমান হইলেন। মায়ামৃগ বায়ুবেগে ধাবিত হইল এবং রামচন্দ্রও তাহার অনুসরণে, ক্রমে, কুটীর হইতে দূরে যাইয়া পড়িলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই রামচন্দ্রের বজ্রসম শরে মারীচের বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইল। মারীচ যন্ত্রণাক্লিষ্ট স্বরে "সীতা! সীতা! লক্ষ্মণ! প্রাণ যায়" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বনরাজী ভেদ করিয়া সেই করুণ স্বর সীতাদেবীর ও লক্ষ্মণের কর্ণে প্রবেশ করিল; উভয়েই চমকিত হইলেন। সীতাদেবী বলিলেন;

"লক্ষ্মণ! এ কি! কে এমন কাতর স্বরে তোমার ও আমার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে! তোমার অগ্রজের কোন বিপদ হয় নাইত? অগ্রসর হইয়া দেখ।"

"লক্ষ্মণ বলিলেন, "দেবি! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এ তাঁহার কণ্ঠস্বর নয়। আপনার ভ্রম হইয়াছে।"

আবার সেই আর্ত্তস্বর উভয়ের কর্ণে প্রবেশ করিল। লক্ষ্মণের প্রবোধ-বাক্য পতিপ্রাণার মনে স্থান পাইল না। সীতাদেবী পুনর্ব্বার বলিলেন, "লক্ষ্মণ! অই শুন! বৃথা আমায় প্রবোধ দিও না; মৃত্যুকালে মনুষ্যের স্বর কি স্বাভাবিক্ থাকে? বিলম্ব করিও না, এখনি অগ্রসর হইয়া দেখ।"

লক্ষ্মণ বলিলেন, "দেবি! পাপিষ্ঠা শূর্পণখার দণ্ডের পর হইতে মায়াবী রাক্ষসগণ দিবারাত্র আমাদিগের ছিদ্রান্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে; এ অবস্থায় আপনাকে একা রাখিয়া আমি কিরূপে গমন করিব! আপনি উদ্বিগ্না হইবেন না; সশস্ত্র আর্য্যকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারে পৃথিবীতে এরূপ ব্যক্তি কেহ নাই।"

লক্ষ্মণ এই বলিয়া অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিলেন।

তৃতীয় বার সেই স্বর, আরও সকরুণ ভাবে, "সীতা! সীতা! লক্ষ্মণ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল! সীতাদেবীর মর্ম্মস্থল

যেন বিদীর্ণপ্রায় হইল, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষু দুইটী জলে পূর্ণ হইল ; তিনি ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিলেন ;

"কাপুরুষ ! তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মৃত্যু-যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছেন, আর তুমি, ক্ষত্রিয় হইয়া, সশস্ত্র পুত্তলিকার ন্যায়, দাঁড়াইয়া আছ ! তোমায় ধিক্ ! ক্ষত্রিয়-সমাজে এ মুখ আর দেখাইও না।"

লক্ষ্মণ বলিলেন, "দেবি ! অকারণে ভীতা হইয়া আমায় তিরস্কার করিতেছেন কেন ? সত্যই আর্য্যের বিপদ বুঝিলে লক্ষ্মণ তাহার তুচ্ছ প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হইবে না।"

পতির অনিষ্ট সম্ভাবনা ভাবিলে সতীর ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা কিছুই থাকে না। লক্ষ্মণের প্রবোধবাক্যে সীতাদেবীর মন শান্ত হইল না। তিনি আরক্তনেত্রে, বজ্রগম্ভীর স্বরে, লক্ষ্মণকে বলিলেন, "কুলাঙ্গার ! তোমার ন্যায় অধমের জন্মে রঘুকুল কলঙ্কস্পৃষ্ট হইল। পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রাণসঙ্কটে তোমায় আহ্বান করিতেছেন, আর তুমি তাঁহাকে রক্ষার জন্য পদমাত্র অগ্রসর হইতেছ না ! তবে কপট ভ্রাতৃপ্রেম দেখাইবার জন্য অরণ্যে আসিয়াছিলে কেন ? তোমার উদ্দেশ্য কি আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমি চলিলাম, দেখি, কে আমায় বিপদে পড়িয়া আহ্বান করিতেছে।"

সীতাদেবী এই বলিয়া কুটীর হইতে বহির্গত হইবার উপক্রম করিলেন। লক্ষ্মণ দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন ;

"দেবি ! অতিসাহসের কার্য্য করিবেন না ; কুটীরে থাকুন, এই আমি চলিলাম ; রঘুকুল-দেবতারা আপনাকে রক্ষা করুন।"

লক্ষ্মণ এই বলিয়া, সীতাদেবীকে প্রণাম করিয়া, ধনুর্ব্বাণহস্তে কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যে বনান্তরালে অদৃশ্য হইলেন।

লক্ষ্মণের অদর্শনের সঙ্গেই সীতাদেবীর হৃদয় প্রবলবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। কি যেন অমঙ্গলের ছায়া তাঁহার অন্তরে পতিত হইল। পত্রের মর্ম্মরে, আশ্রমপালিত মৃগশাবকের পদ-সঞ্চারে এবং বায়ুর হিল্লোলে তিনি চমকিতা হইতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে অতীত হইলে সীতাদেবী দেখিতে পাইলেন জটাজূটধারী, বিশালকায় এক সন্ন্যাসী বনাভ্যন্তর হইতে তাঁহার কুটীরের দিকে আগমন করিতেছেন। যতই তিনি নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মূর্ত্তি সীতাদেবীর সুস্পষ্ট গোচর হইতে লাগিল। আগন্তুকের পরিধান রক্তবর্ণ বসন, করে কমণ্ডলু, ললাটে বিভূতিরাগ, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমাল্য। সুদীর্ঘ জটাজাল, তাঁহার গ্রীবা এবং স্কন্ধ আবৃত করিয়া, পৃষ্ঠদেশে পতিত হইয়াছিল। তাঁহার দেহ মাংসল, সুগঠিত এবং অসাধারণ বলব্যঞ্জক। সাধারণ সন্ন্যাসীতে সেরূপ বলবত্তার লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। সন্ন্যাসী, আশ্রমের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া, গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমি ক্ষুধার্ত্ত অতিথি, কে আছ, ভিক্ষা দাও।"

শ্রবণ মাত্র সীতাদেবী কুটীরাভ্যন্তর হইতে বলিলেন; "প্রভো! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি একাকিনী কুটীরে অবস্থিতি করিতেছি। আমার স্বামী ও দেবর এখনই প্রত্যাগমন করিয়া আপনার সমুচিত সৎকার করিবেন।"

সন্ন্যাসী ক্রোধবিকম্পিত স্বরে বলিলেন, "অনৃতাচারিণি! অতিথির অপমাননায় তোমার ভয় নাই! তোমার অবসর ও সুবিধার প্রত্যাশায় আমি অনাহারে অপেক্ষা করিব! এই আমি চলিলাম! আমার সঞ্চিত পাপ তোমাদিগের এবং তোমাদিগের সঞ্চিত পুণ্য অদ্য হইতে আমার হউক।"

সন্ন্যাসী এই বলিয়া গমনোদ্যত হইলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া

সীতাদেবীর হৃদয় ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি কাতর বচনে বলিলেন "প্রভো! যাইবেন না, আতিথ্য গ্রহণ করুন।"

এই বলিয়া তিনি সর্ব্বাঙ্গ বসনে আবৃত করিয়া এবং অতিথি-সেবার উপযুক্ত অর্ঘ্যও ফল মূল গ্রহণ করিয়া কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন এবং তাহা সন্ন্যাসীর সম্মুখে রাখিয়া বিনম্রভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী একবার তাঁহার আপাদ মস্তক দর্শন করিল। সে দর্শনে সীতাদেবীর শরীর যেন কণ্টকবিদ্ধ হইল।

সন্ন্যাসী তখন অতি মধুরস্বরে সীতাদেবীকে বলিল, "সুন্দরি! আমি রাক্ষসাধিপতি রাবণ, ত্রিভুবনে অতুলনীয়া, সমুদ্রপরিবেষ্টিতা লঙ্কাপুরী আমার রাজধানী। তোমার অনুপম রূপ লাবণ্যের কথা শুনিয়া আমি তোমার অনুসন্ধানে এখানে আসিয়াছি। আজ আমার নয়ন সার্থক হইল। এক্ষণে আমার সঙ্গে চল; পৃথিবীতে যে সুখ কোন রমণী কখনও ভোগ করে নাই, তুমি তাহা ভোগ করিবে। পিতৃতাড়িত, বান্ধবহীন, ক্ষুদ্র রাম তোমার পতি হইবার যোগ্য নয়, তুমি আমারই মহিষী হইবার উপযুক্তা; লঙ্কাপুরীর অধীশ্বরী হইলে শত অযোধ্যার সম্পদ তোমার ভোগ্য হইবে।"

শ্রবণ মাত্র সীতাদেবীর চক্ষু দুইটী ক্রোধে আরক্ত হইল, সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন;

"পাপিষ্ঠ! সাধু সজ্জন বেশে আমাকে আহ্বান করিয়া এরূপ প্রস্তাব করিতে তোর লজ্জা বোধ হইল না? আজ যদি রামচন্দ্র বা লক্ষ্মণ এখানে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে এইক্ষণে তোর পাপ জিহ্বা শত খণ্ডে কর্ত্তিত হইত। তুই আমাকে সামান্যা নারী মনে করিয়া এইরূপ প্রস্তাবে সাহস করিলি! কিন্তু তুই জানিস্, আমি রাজর্ষি জনকের কন্যা, রাজা দশরথের পুত্রবধূ; আমার স্বামী রামচন্দ্র সিংহ, তুই কুক্কুর! কুক্কুর হইয়া তুই সিংহীর প্রতি

লোভ করিতেছিস্। যদি প্রাণের মায়া থাকে, তবে রামচন্দ্র বা লক্ষ্মণ ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই পলায়ন কর্।"

সীতাদেবী এই সময় দেখিতে পাইলেন রক্তপতাকা-সমন্বিত, খরবাহিত এক দিব্য রথ, ধীরে ধীরে, বনপথে আসিয়া আশ্রম-দ্বারে দণ্ডায়মান হইল। দর্শনমাত্র সন্ন্যাসী আপনার জটাজাল ও কমণ্ডলু দূরে নিক্ষেপ করিল এবং সীতাদেবীর দিকে অগ্রসর হইয়া হস্ত দ্বারা তাঁহাকে আকর্ষণপূর্ব্বক পরিহাসসূচক স্বরে বলিল;

"সুন্দরি! অত ক্রুদ্ধা হইও না। তোমার মত শত শত রূপসীর ক্রোধ আমি দেখিয়াছি, এখন তাহারা আমার পদানতা। চল, আমার সঙ্গে রথারোহণ কর।"

পাপিষ্ঠ, এই বলিয়া, সীতাদেবীকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া, রথে স্থাপন করিল। তাহার ইঙ্গিত মাত্র সারথি সবলে কশাঘাত করিলে বাহনদ্বয় বায়ুবেগে ধাবিত হইল। সীতাদেবী রথ হইতে লম্ফ দিয়া পড়িবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পাপিষ্ঠ তাঁহার উন্মুক্ত কেশ ও বস্ত্র ধারণ করিয়া প্রতিরোধ করিল। রথ বায়ুবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। সীতাদেবী রামচন্দ্রের ও লক্ষ্মণের নাম উচ্চারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং স্বর্গের দেবগণ হইতে অরণ্যের পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত সকলকেই সম্বোধন করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার ক্রন্দনে বনভূমি আকুল হইয়া উঠিল; কিন্তু হায়! কেহই তাঁহাকে রক্ষা করিতে সক্ষম্ হইলেন না। কেবল মধ্যপথে গৃধ্ররাজ জটায়ু তাঁহার রক্ষার জন্য সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণদান করিয়া বীরজন্ম সার্থক করিলেন। সীতাদেবী রথ হইতে মধ্যে মধ্যে আপনার অলঙ্কারগুলি নিক্ষেপ করিয়া চিহ্ন রাখিতে লাগিলেন। যোজনের পর যোজন অতিক্রান্ত হইতে লাগিল। বৃক্ষলতা নিষ্পিষ্ট করিয়া,

শিলাখণ্ড চূর্ণিত করিয়া, রথ দিবারাত্র অবিরাম গতিতে লঙ্কাভি-মুখে ধাবিত হইল। ক্রমে নীলোর্ম্মিময় মহা সমুদ্র সীতাদেবীর নয়ন-গোচর হইল। রাবণ, সমুদ্র অতিক্রম করিয়া, দুর্ভেদ্য প্রাকার-বেষ্টিতা, কাঞ্চন-সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কাপুরীতে উপনীত হইল।

এদিকে রামচন্দ্র, মৃগরূপী মারীচকে বধ করিয়া, কুটীরাভি মুখে প্রত্যাগমনপথে লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইলেন। মারীচের কপট আহ্বান শ্রবণে পাছে লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া আসেন এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় উৎকণ্ঠিত ছিল, লক্ষ্মণকে দেখিয়া তাঁহার উৎকণ্ঠা দ্বিগুণিত হইল। উভয়ে দ্রুতবেগে কুটীরাভিমুখে ধাবিত হইলেন, কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন কুটীর শূন্য। দ্বারদেশে অতিথি-সৎকার-যোগ্য অর্ঘ্যপাত্র ও ফলমূল পতিত আছে এবং সম্মুখস্থ পথে রথচক্রের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। তখন প্রকৃত অবস্থা অনুমান করিতে উভয়ের বিলম্ব হইল না। রামচন্দ্রের হৃদয় যেন শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি কখনও পর্ব্বতশিখরে, কখনও নদীতটে, কখনও বনাভ্যন্তরে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে "সীতা সীতা" বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন, কিন্তু সীতাদেবী কোথায়? কে উত্তর দিবে? তিনি নদীতট হইতে ডাকেন, "সীতা! সীতা!" প্রতিধ্বনি অপর পার হইতে বলে "নীতা নীতা"। তিনি পর্ব্বত-শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন "সীতা! সীতা"! গিরিগহ্বর প্রতিধ্বনিচ্ছলে গম্ভীর স্বরে বলে "হৃতা হৃতা"। সীতাদেবী যে সকল স্থলে ভ্রমণ ও উপবেশন করিতে অভ্যস্তা ছিলেন, যে কমল-গন্ধ-সুরভি সরোবরে স্নান করিতে ও যে মাধবীমণ্ডপে মধ্যাহ্নে শয়ন করিতে ভাল বাসিতেন, উভয়ে তন্ন তন্ন করিয়া সেই সকল স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। একবার খুঁজিয়া তৃপ্তি হয় না,

দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বার, তাহার পর আরও একবার, সেই একই স্থান খুঁজিয়া দেখেন, কিন্তু সীতাদেবী তখন বহু যোজন দূরে; কোথায় তাঁহার সন্ধান পাইবেন। তখন উভয়ে, অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া, রথচক্রের চিহ্ন অনুসারে, দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথমধ্যে রক্তাক্ত, মৃতকল্প জটায়ুকে দেখিতে পাইয়া উভয়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। জটায়ু, আপনার তাদৃশ অবস্থার কারণ এবং রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ-বৃত্তান্ত বর্ণন পূর্ব্বক, প্রাণত্যাগ করিলেন। শুনিয়া রামচন্দ্র ক্রোধে অগ্নিপ্রায় হইলেন এবং রাবণকে সমুচিত শাস্তিদানের জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। জটায়ুর প্রেতকৃত্য সমাপন করিয়া উভয়ে পুনর্ব্বার দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কঠিন প্রস্তরবৎ ভূমিতে অনেক স্থলে রথচিহ্ন লুপ্ত হইয়াছিল; তাঁহারা কোথাও নিষ্পেষিত তরুগুল্ম, কোথাও চক্ররেখা, কোথাও বা সীতাদেবীর নিক্ষিপ্ত অলঙ্কার লক্ষ্য করিয়া গন্তব্যপথ স্থির করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা মাল্যবান পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। নবীন মেঘমালা তৎকালে মাল্যবানের শিখর আবৃত করিয়াছিল, এবং কুসুমিত কদম্ব তরুতে গিরিদেহ আপাদমস্তক আবৃত হইয়াছিল। মদমত্ত ময়ূরগণ সেই সকল কদম্বতরুর শাখায় বসিয়া ময়ূরীদিগের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল। তাঁহারা তথা হইতে পম্পাসরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন। পম্পার জল অতি নির্ম্মল; নানাবর্ণের জলজ পুষ্পসমূহ বিকসিত হওয়াতে পম্পার শোভার তুলনা ছিল না। জলে হংস হংসীদল এবং তটস্থিত শাদ্বল ভূমিতে মৃগ ও মৃগীগণ সুখে বিচরণ করিতেছিল। এই সকল রমণীয় স্থান দর্শনে রামচন্দ্রের সীতাশোক দ্বিগুণিত হইল। লক্ষ্মণ সুমিষ্ট বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েক দিবস অতীত হইলে,

একদিন, তাঁহারা ঋষ্যমূক নামে কোনও পর্ব্বতের শিখরে অমানুষ বীরাকৃতি পাঁচটী পুরুষকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইলেন। তাহার পর যাহা হইল, পাঠক! তাহা পরে জানিতে পারিবেন। অসহায়া সীতাদেবীকে লঙ্কাপুরীতে লইয়া রাবণ তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেছে, আসুন, তাহা অগ্রে দর্শন করি।

নবম পরিচ্ছেদ।

লঙ্কার পশ্চিমাংশে সাগরবারি বিদীর্ণ করিয়া সুবেলপর্ব্বত উত্থিত হইয়াছে। তাহার শৃঙ্গসমূহ নাগরাজ বাসুকীর ফণার ন্যায় বহু যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। পর্ব্বতের যে অংশ সমুদ্রের দিকে স্থিত, তাহা লম্বভাবে প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান; অপরদিক, ক্রমনিম্ন হইয়া, সমতল ভূমিতে মিলিত হইয়াছে। পর্ব্বত-চূড়ায় রাক্ষসরাজ রাবণের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত। তাহার তিন দিক দুর্ভেদ্য প্রাচীরে ও পরিখাদ্বারা রক্ষিত, কেবল যে দিকে সমুদ্র অবস্থিত, দুরাক্রম্য বলিয়া সেদিকে প্রাচীর বা পরিখা নাই। পর্ব্বতের শৃঙ্গে, শৃঙ্গে রাক্ষসরাজের ও তাহার পরিবারবর্গের রমণীয় প্রাসাদ অবস্থিত। প্রত্যেক প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে নানা-জাতীয় পুষ্পের কুঞ্জ এবং শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ভূমি। পালিত ময়ূর ও মৃগগণ তাহাতে আনন্দে বিচরণ করিতেছে। সুপ্রশস্ত রাজপথসমূহ, মহাকায় সর্পের ন্যায় শৈলদেহ বেষ্টন করিয়া, শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে মিলিত হইয়াছে। পথের উভয় পার্শ্বে নানাজাতীয় পুষ্পবৃক্ষের শ্রেণী এবং মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম নির্ঝর। সেই সকল নির্ঝর হইতে অনবরত মুক্তাফলের ন্যায় বারি নির্গত হইতেছে।

পর্ব্বতের সানুদেশে পুরবাসীদিগের ভবন। মহামূল্য সজ্জায় সজ্জিত অট্টালিকা, নানাজাতীয় দ্রব্য-সম্ভার-পূর্ণ বিপনী, নাট্য-শালা, মধুপানগৃহ, এবং দেবমন্দির সমূহ রাক্ষসপুরীর শোভা বৰ্দ্ধন করিতেছে। স্থানে স্থানে ছায়াশীতল রসালকুঞ্জ ও কমলদল-পূর্ণ সরোবর। পর্ব্বত, সমুদ্র এবং উপবন তিন মিলিত হওয়াতে লঙ্কাপুরী সৌন্দর্য্যে যক্ষরাজপুরী অলকাকেও পরাজিত করিয়াছে।

পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে রাক্ষসরাজের ও তাহার প্রিয় মহিষী-গণের ভবন। নানাজাতায় বহুমূল্য প্রস্তর, প্রবাল, স্বুবর্ণ, মুক্তা এবং গজদন্তে সেই সকল ভবন খচিত। নগরীর এই অংশে রথের ঘর্ঘর শব্দ, কার্ম্মুকের টঙ্কার এবং অশ্বের হ্রেষা শ্রুত হয় না; তাহা কেবলই নৃত্য, গীত ও আনন্দধ্বনিতে পূর্ণ। দিবাকরের স্বুবর্ণময় করজাল তাহাকে উজ্জ্বল করে; চন্দ্রমার শুভ্র কিরণে তাহা বিধৌত হয় এবং সাগরোত্থিত বায়ু তাহাকে নিরন্তর স্বুখশীতল করিয়া রাখে। অনুপম স্বুন্দরীগণের কলহাস্যে ও অলঙ্কারসিঞ্জনে তাহা সর্ব্বদা মুখরিত থাকে। রাবণ এই স্বুখময়ী পুরীতে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় প্রতাপে বাস করে।

সীতাদেবীকে হরণের কিয়ৎকাল পরে, একদিন অপরাহ্নে, রাবণ আপনার প্রাসাদস্থ একটী নিভৃত কক্ষে সিংহাসনে উপবিষ্ট আছে। অপর কেহ সেখানে নাই; কেবল তাহার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে মধ্যবয়স্কা একটী রমণী দণ্ডায়মানা রহিয়াছে। যৌবনশ্রী অপগত হইলেও তাহাকে দেখিলে স্বুন্দরী বলিয়া মনে হয়। তাহার সর্ব্বাঙ্গ রত্নালঙ্কারে বিভূষিত, পরিধান চম্পকবর্ণের বসন। যে রাক্ষসরাজের পরাক্রমে অপর সকলে ভীত, সাধারণ রমণী হইয়াও সে তাহার প্রতি কোন বিশেষ সম্ভ্রমের ভাব প্রকাশ করিতেছে না। হাস্যে, অঙ্গভঙ্গীতে এবং কটাক্ষপাতে সে এরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছে,

যেন রাক্ষসরাজের সঙ্গে তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। রাক্ষসরাজ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল; "দন্তিকে! সীতাকে ত অনেক-দিন তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছি; কি বুঝিতেছ? কত দিনে তাহাকে আমার বশীভূতা করিতে পারিবে?"

দন্তিকা হাসিয়া বলিল; "অধিক বিলম্ব নাই; তুমি দিগ্বিজয়ী বীর, যেদিন সূর্য্যদেবকে প্রভাতে পশ্চিমদিকে উদিত করিতে পারিবে, সেই দিনই সীতা তোমার বশীভূতা হইবে।"

রাবণ। "তোমার সকল কথাতেই রহস্য; সূর্য্য কি পশ্চিমে উদিত হওয়া কখনও সম্ভবপর?"

দন্তিকা। "সতীর পক্ষে কি পরপুরুষসেবা কখনও সম্ভবপর?"

রাবণ। "এ বয়সে অনেক সতী দেখিয়াছি, কেহ তিন দিনের, কেহ তিন মাসের; তিন বৎসরের সতী ত এ পর্য্যন্ত দেখি নাই। বলপ্রয়োগে একদিনেই আমি সীতার দর্প চূর্ণ করিতে পারি। কিন্তু আমি তাহাকে আমার প্রধানা মহিষী করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি। বলপ্রয়োগে তাহার মহিষীপদের মর্য্যাদা চিরদিনের জন্য নষ্ট হইবে। তাহার পর সীতা যেরূপ তেজস্বিনী তাহাতে বলপ্রয়োগ করিলে সে অভিমানে আত্মহত্যা করিতে পারে। এই সকল কারণে, সময় দিয়া, তাহাকে অল্পে অল্পে বশীভূতা করিতে আমার ইচ্ছা। আমার প্রাসাদ, উপবন, রত্নভাণ্ডার সকলই উন্মুক্ত করিয়া দিতেছি। সীতা কোন বস্তু আহার করিতে ভালবাসে, কিরূপ বস্ত্রালঙ্কার তাহার প্রিয়, অনুসন্ধান কর। স্ত্রীজাতি হইয়া ভোগসুখের জন্য আত্মবিক্রয় না করে, এমন কাহাকেও ত আমি এ পর্য্যন্ত দেখি নাই। আমার গন্ধোৎকটা নামে যে হস্তিনী ধৃত করিবার সময় সর্ব্বাপেক্ষা উগ্র ও অদম্য ছিল, সুখাদ্যের লোভে সেই এখন আমার সর্ব্বাপেক্ষা বশীভূতা। সেই এখন অন্য

হস্তিনীদিগকে ধৃত করিয়া আনে। তুমিও ত এক দিন সতীপণা দেখাইয়াছিলে!”

দন্তিকা ভ্রূকুটী করিয়া বলিল, “দুরাচার! আমার সর্ব্বনাশ করিয়া আবার আমায় ব্যঙ্গ করিতেছ? আমার স্বামী, আত্মীয়, স্বজন যুদ্ধে নিহত না হইলে আমি তোমার কেমন বশীভূতা হইতাম, দেখিতে পাইতে। আমি চলিলাম।”

দন্তিকা এই বলিয়া ক্রোধে গমনোন্মুখী হইলে রাক্ষসরাজ তাহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল, “দন্তিকে! একটী রহস্যও কি করিতে দিবে না? এত বস্ত্রালঙ্কার দিয়া, এত ভালবাসিয়াও, তোমার মন পাইলাম না, ইহাই আশ্চর্য্য।”

দন্তিকা শুনিয়া অবজ্ঞার সহিত বলিল; “ধূর্ত্ত! আর ভালবাসার কথা মুখে আনিও না। বস্ত্রালঙ্কার দিতেছ সত্য, কিন্তু তুমি তোমার গন্ধোৎকটা হস্তিনীকে যে জন্য রাখিয়াছ, আমাকেও যে সেইজন্য রাখিয়াছ, তাহা কি আমি বুঝিতে পারি না? আমার কথা শুন! আমি স্বয়ং সতী না হইলেও কে সতী, কে অসতী তাহা বুঝিতে পারি। তুমি এ পর্য্যন্ত প্রকৃত সতী রমণী দেখ নাই, তাই সতীর শক্তি, সতীর গৌরব জান না। নিশ্চয় জানিও, তুমি সীতাকে কিছুতেই বশীভূতা করিতে পারিবে না।”

রাবণ। “ভাল! পরীক্ষা করিয়া দেখি। এখন তুমি বল, তাহাকে বশীভূতা করিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলে?”

দন্তিকা। “অন্য সকলের সম্বন্ধে যে যে চেষ্টা করিয়াছি, তাহার সম্বন্ধে বরং তদপেক্ষা অধিক চেষ্টা করিয়াছি। প্রথমে নির্য্যাতন, তাহার পর সুখের প্রলোভন, সান্ত্বনা, ভর্ৎসনা, কিছুই অপরীক্ষিত রাখি নাই। তাহাকে সপ্তাহকাল অনাহারে রাখিয়া তাহার পর অমৃতের ন্যায় স্বাদু অন্ন, পানীয় নির্জ্জনে তাহার নিকট রাখিয়া

দিয়াছি; কিন্তু সীতা একবার সে দিকে দৃষ্টিপাতও করে নাই। যেখানে দংশ, মশক ও বৃশ্চিকের উৎপাতে লোকে চক্ষু মুদিত করিতে পারে না, রাত্রির পর রাত্রি, সীতাকে সেই বৃক্ষতলে রাখিয়া, পরে, উৎকৃষ্ট স্থানে, দুগ্ধফেননিভ শয্যা রচনা করিয়া তাহাকে শয়ন করিতে আহ্বান করিয়াছি, কিন্তু সীতা, ধ্যানস্থা হইয়া, সেই বৃক্ষতলেই রাত্রি যাপন করিয়াছে; শয্যার নিকটেও যায় নাই। ধ্যানাবস্থায় তাহাকে দেখিয়া মনে হইয়াছে যেন তরুতলে কেহ স্বর্ণময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কেবল "রাম রাম" উচ্চারণে তাহার অধরোষ্ঠের কম্পন হইতেই তাহাকে জীবিতা বলিয়া জ্ঞান হইয়াছে। যখন তীব্র উত্তর বায়ুতে লোকের শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাহার সমীপে সুখস্পর্শ, লোমজ বস্ত্র রাখিয়া দিয়াছি, কিন্তু সীতা তাহা স্পর্শও করে নাই। তৈলাভাবে সীতার মস্তকের কেশ রূক্ষ, অনাহারে তাহার দেহ ক্ষীণ, অসংস্কারে তাহার বর্ণ মলিন, চিন্তায় তাহার কপোলদ্বয় পাণ্ডুবর্ণ; তথাপি তাহার কান্তিতে অশোকবন উজ্জ্বল হইয়া আছে। জানি না সীতা কোন্ মন্ত্রে দীক্ষিতা, কোন্ দেবতার বলে বলবতী। ধর্ম্মের জন্যই হউক আর অধর্ম্মের জন্যই হউক, তুমি আমায় আশ্রয় দিয়াছ; তোমার হিতের জন্য দুই একটী কথা বলি, শুন। লালসার শেষ নাই; ভোগে কখনও কামনার তৃপ্তি হয় না। বিধাতার নিয়মে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবেই হইবে। তোমার পাপভার যথেষ্ট হইয়াছে; সীতার ন্যায় সতীর ধর্ম্মনাশের চেষ্টা করিয়া সবংশে ধ্বংস হইও না।"

রাবণ শুনিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ রহিল, পরে বলিল; "তোমার উপদেশ রাখিয়া দাও, এখন বল, সীতাকে আমার ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছিলে কি না। আমার কথা বুঝিলে ত?"

দন্তিকা বলিল, "বুঝিলাম বই কি! সেদিন সন্ধ্যার পর, সীতাকে লইয়া, পুষ্পকারোহণে তোমার প্রিয় মহিষীদিগের পুরী দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলাম। আমার উপদেশে সে দিন গৃহে, গৃহে উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। গন্ধতৈলপূর্ণ স্ফটিক-দীপের আলোকে পুরী উজ্জ্বল, চন্দন-বারিতে গৃহ, প্রাঙ্গণ ও পথ সিক্ত, এবং পুষ্পাভরণে তোরণসমূহ সুসজ্জিত হইয়াছিল। নৃত্য, গীত ও বাদ্যধ্বনিতে প্রতিগৃহ মুখরিত হইতেছিল; সুস্বাদু খাদ্যের ও অমৃততুল্য মদিরার গন্ধ চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইতেছিল। সুবেশা, সুরূপা দাসীগণ ময়ূরপুচ্ছ-নির্ম্মিত ব্যজনী হস্তে সিংহাসনস্থা, রত্নালঙ্কার-বিভূষিতা তোমার মহিষীদিগকে ব্যজন করিতেছিল। আমি তাহাদিগকে দেখাইয়া সীতাকে বলিলাম, "বৈদেহি! দেখ, এই সকল রমণীদিগের মধ্যে কেহ সামান্য গৃহস্থের বধূ, কেহ বনচারী তপস্বীর পত্নী, কেহ বা কৃষিজীবীর দুহিতা ছিল, কিন্তু আমাদের মহারাজের কৃপায় ইহারা এক্ষণে ইন্দ্রাণীর ন্যায় সুখে কালযাপন করিতেছে।"

"রাক্ষসরাজ শুনিয়া ব্যগ্রচিত্তে বলিল; "শুনিয়া সীতা কি বলিল?"

দন্তিকা। "সীতা প্রথমে কিছুই বলিল না; কিন্তু দেখিলাম, তাহার নীলোৎপল তুল্য চক্ষু দুইটী হইতে অশ্রুধারা নির্গত হইতেছে।"

রাক্ষসরাজ! "ইহাই ত আমি চাহিতে ছিলাম। আমার মহিষী হইলে যে কি সুখ তাহা সে বুঝিয়াছে; আমার মহিষীদিগের সহিত তুলনায় নিজের শোচনীয় অবস্থা ভাবিয়াই নিশ্চয় সে অশ্রুপাত করিয়াছে। তবে তুমি বলিতেছিলে কেন যে, সে কখনই আমার বশীভূতা হইবে না? আর সপ্তাহকাল চেষ্টা কর, দেখিবে, সীতা আমার ক্রোড় ছাড়িয়া কোথাও যাইতে চাহিবে না।"

দন্তিকা। নির্ব্বোধ! শুন, সীতা নিজের কষ্টের জন্য ক্রন্দন করে নাই; সীতা তোমার মহিষীদিগের পরিণাম দেখিয়াই ক্রন্দন করিয়াছিল। সীতা বলিল; "হতভাগিণীগণ! এই তুচ্ছ সুখের জন্য নারীর সর্ব্বস্ব ধন সতীত্ব বিসর্জ্জন করিয়াছ! ইহার অপেক্ষা কুক্কুরীর ন্যায় রাজপথের ধূলিলিপ্ত উচ্ছিষ্ট অন্ন আহার করিয়া প্রাণধারণ করিলেও ত ভাল হইত। সতীত্ব রক্ষার জন্য প্রাণ দিলে না কেন?" তাহার পর সীতা আমাকে বলিল; "দূতি! আমায় এ দৃশ্য আর দেখাইও না; নারী হইয়া নারীর অধঃপতন আর দেখিতে পারি না।"

"এখন তুমি বুঝিলেত!"

রাবণ এইবার একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল; "বুঝিলাম, কিন্তু প্রাণ থাকিতে সীতার আশা ত্যাগ করিতে পারিব না। তুমি যাও, সন্ধ্যার পর আমি স্বয়ং আজ অশোকবনে যাইব, দেখিব, সীতা আমার বশীভূতা হয় কি না।"

দন্তিকা রাবণকে অভিবাদন করিয়া বিদায় লইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

রাবণের প্রাসাদের অবিদূরে একটী সুন্দর উপবন সুবেলশিখর হইতে ত্রিকূটশৃঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চম্পক, বকুল, নাগকেশর, অশোক, কিংশুক, কদম্ব প্রভৃতি তরুদলে তাহা সকল ঋতুতেই অপূর্ব্ব শোভায় সুশোভিত থাকিত। বসন্ত সময়ে যখন তাহাতে গুচ্ছে গুচ্ছে অশোককুসুম প্রস্ফুটিত হইত, তখন তাহার শোভার উপমা থাকিত না। অন্যান্য তরু সত্বেও অশোকতরুর বাহুল্য বশতঃ তাহা অশোকবন নামেই পরিচিত ছিল। রাবণ সীতা-

দেবীকে এই অশোকবনে প্রহরিণীগণে পরিবৃতা করিয়া রাখিয়া ছিল। একদিকে সমুদ্র, অপর তিন দিকে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীর উপবনটীকে লোকচক্ষুর অদৃশ্য করিয়া রাখিত। রাবণ ভিন্ন অপর কোনও পুরুষের তাহাতে প্রবেশাধিকার ছিল না। প্রহরিণী-গণ অতি সাবধানে তাহার প্রবেশপথ রক্ষা করিত। কিন্তু উপবনের যে অংশে পর্ব্বত সমুদ্রের দিকে লম্ব ভাবে উঠিয়াছিল, সেই দিক হইতে কাহারও উপবনে প্রবেশের সম্ভাবনা ছিল না বলিয়া সে দিকে কোন প্রহরিণী থাকিত না। যে দিন অপরাহ্ণে রাবণ দন্তিকার সহিত কথোপকথন করিতেছিল, সেই দিন, সন্ধ্যার পূর্ব্বে, উপবনের এই অংশে, একটী শিলাস্তূপের উপর দণ্ডায়মানা হইয়া কোনও অনুপম লাবণ্যবতী রমণী এক দৃষ্টে সমুদ্র দর্শন করিতেছিলেন। তাঁহার পরিধেয় বসন জীর্ণ ও মলিন, তাঁহার দেহ অলঙ্কারশূন্য, এবং মস্তকের কেশ রুক্ষ; একমাত্র বেণীর আকারে তাঁহার কেশদাম তাঁহার জানু স্পর্শ করিতেছিল। সান্ধ্য বায়ু, ধীরে ধীরে, প্রবাহিত হইয়া, তাঁহার অলকদাম কম্পিত করিতে ছিল। তাঁহার দৃষ্টি স্থির এবং অঙ্গ নিশ্চল; তাঁহাকে দেখিলে সুনিপুণ শিল্পীর নির্ম্মিত দেবীমূর্ত্তি বলিয়া মনে হইত। বলা নিষ্প্রয়োজন ইনিই সীতাদেবী। তাঁহার সম্মুখে সীমাশূন্য, নীলোজ্জ্বল মহাসমুদ্র প্রসারিত। সীতাদেবী এক দৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া-ছিলেন আর ভাবিতে ছিলেন, "এই অকূল সাগর অতিক্রম করিয়া প্রভু কি কখন এখানে আসিতে পারিবেন? না। তবে আমার উদ্ধারের আশা কোথায়? মৃত্যু ভিন্ন এই দুরাচারের হস্ত হইতে আমার নিষ্কৃতির উপায় নাই। কিন্তু দেখি; মৃত্যুত আমার হস্তেই আছে। মরিলেত তাঁহাকে দেখিতে পাইব না। আত্মহত্যা-জনিত পাপে পরলোকেও তাঁহার সহিত মিলনের আশা নষ্ট হইবে। আর

আমি মরিলে হয়ত পাপিষ্ঠকে দণ্ড দিবার জন্য তাঁহার তাদৃশ আগ্রহ থাকিবে না। সুতরাং যতই কষ্ট হউক মরিব না; দেখি কি হয়।”

তিনি যে শিলাস্তূপের উপর দণ্ডায়মান ছিলেন, তাহার নিম্নেই পাষাণময় বন্ধুর বেলাভূমি; উচ্ছৃঙ্খল তরঙ্গরাজী পুনঃ পুনঃ তাহাতে আঘাত করিয়া ফেনদাম বিকীর্ণ করিতেছিল। সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে দূরবর্ত্তী নারিকেলকুঞ্জে ঘনীভূত হইতে ছিল। হংস, সারস এবং চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ সন্ধ্যাসমাগমে সমুদ্রকূল ত্যাগ করিয়া উড্ডীন হইতেছিল। জালজীবিগণ, সমুদ্রতটস্থ গুল্মে আপনাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা বন্ধন করিয়া গৃহাভিমুখে গমনের উদ্যোগ করিতেছিল। ক্রমে সূর্য্য সমুদ্র-বারি অলক্তক রাগে রঞ্জিত করিয়া তন্মধ্যে নিমগ্ন হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আবৃত হইল। এই সময় সীতাদেবী দেখিতে পাইলেন এক অদ্ভুতদর্শন, মহাকায় পুরুষ বেলাভূমি হইতে আসিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিতেছে। পর্ব্বতপার্শ্ব এই স্থানে এরূপ দুরারোহ যে, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, পার্ব্বত্য ছাগও সেথান দিয়া আরোহণ করিতে পারে না। কিন্তু আগন্তুক, অবলীলাক্রমে, কথনও পর্ব্বতপার্শ্ব হইতে বিলম্বিত বৃক্ষশাখা ধারণ করিয়া, কথনও প্রস্তর হইতে প্রস্তরে উল্লম্ফন দিয়া, মহাবেগে অগ্রসর হইতেছিল। ক্রমে চন্দ্রোদয় হইল; সীতাদেবী দেখিতে পাইলেন আগন্তুকের দেহ অতি প্রকাণ্ড; তাহার বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত, বক্ষস্থল বিশাল, হনুদ্বয় উন্নত, গ্রীবা ও স্কন্ধ মাংসল এবং সর্ব্বাঙ্গ সুদৃঢ়। দেখিবামাত্রই তাহাকে অসাধারণ বলশালী বলিয়া মনে হয়। সে, লম্ফে লম্ফে আসিয়া, যে শিলাস্তূপের উপর সীতাদেবী দণ্ডায়মানা ছিলেন, তাহার নিম্নে উপস্থিত হইল।

সীতাদেবী তাহাকে দেখিয়া চমকিতা হইলেন, ভাবিলেন একি রাবণের চর কোন দুরভিসন্ধিতে আমার নিকট আসিয়াছে; আবার ভাবিলেন তাহা হইলে, এভাবে, এ পথ দিয়া আসিবে কেন? তবে কি এ আমার প্রভুর দূত গোপনে আমার অনুসন্ধানে আসিয়াছে। ভাবিতে তাঁহার সর্ব্বশরীর আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এই সময় "মহারাজ আসিতেছেন, মহারাজ আসিতেছেন" বলিয়া চেড়ীদিগের কোলাহল শ্রুত হইল। শুনিয়া সীতাদেবী শিলাস্তূপ হইতে অবতরণ করিলেন। আগন্তুকও সেই অবসরে কোথায় যে বৃক্ষান্তরালে অন্তর্হিত হইল, তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন না।

চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে অশোক বন দ্বিগুণ শোভায় সুশোভিত হইয়াছিল। মৃদুবায়ু উপবনস্থ বকুলবৃক্ষের শাখা কম্পিত করিয়া চতুর্দ্দিকে তীব্র মধুর সৌরভ বিকীর্ণ করিতেছিল। রাক্ষসরাজ, মদিরাপানে স্খলিতপদে এবং ঘূর্ণিত নয়নে, অনুচরীগণে পরিবৃত হইয়া, অশোকবনে প্রবেশ করিল। অস্ত্রধারিণী ও আলোক-বর্ত্তিধারিণী চেড়ীগণ তাহার অগ্রে অগ্রে এবং তাহার মহিষীগণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিল। তাহার পশ্চাতে শত শত সুবেশা দাসী তাহার অনুগমন করিতেছিল। তাহাদিগের মধ্যে কাহারও হস্তে মহামূল্য রত্নালঙ্কার, কাহারও হস্তে স্বর্ণ-খচিত কৌষেয় বসন, কাহারও হস্তে সুরস খাদ্য, কাহারও হস্তে সুশীতল বারিপূর্ণ স্বর্ণময় ভৃঙ্গার, কাহারও হস্তে মদিরাপূর্ণ পাত্র। রাবণ, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া, যে তরুমূলে সীতাদেবী আপনার জীর্ণ বসন ও বাহুদ্বারা বক্ষ আবৃত করিয়া অধোবদনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় উপনীত হইল। দুর্ব্বৃত্ত বহুক্ষণ তাঁহাকে মুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "নিষ্ঠুরে! আমি তোমার

একান্ত অনুগত; তোমা ভিন্ন আমার প্রাণরক্ষা হইবে না। সেই জন্য বারংবার তোমার দুর্ব্বাক্য শ্রবণ সত্ত্বেও আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। দেখ, জ্যোৎস্নালোকে এই উপবনের কি অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে; বকুল ও চম্পকের গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে। এ সময় তোমাকে এ বেশে এই তরুতলে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। এ বেশ ত্যাগ কর, ইহা তোমার উপযুক্ত নয়। এই দেখ দাসীগণ আমার ভাণ্ডারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন, দেবদুর্লভ বস্ত্রালঙ্কার এবং সুখাদ্য ও সুপেয় লইয়া তোমার আদেশ অপেক্ষা করিতেছে; ইচ্ছানুরূপ এই সকল বস্তু উপভোগ কর। অথবা এ সকল যদি তোমার মনোমত না হয় তবে পৃথিবীতে কোন্ বস্তু তোমার অভিলষিত তাহা আমাকে বল। আমি তোমার পিতা জনককে পৃথিবীর অধীশ্বর করিয়া দিব; তোমার আত্মীয়, স্বজনদিগকে তাহাদিগের ঈপ্সিত বস্তু প্রদান করিব; তোমাকে আমার মহিষীদিগের মধ্যে প্রধানা করিব; দেবকন্যাগণ তোমার সেবা করিবে। আমার পুষ্পকরথ, সর্ব্বর্ত্তুসুখ প্রাসাদ, নন্দনবিজয় উপবন তোমার হইবে। কৈলাস হইতে লঙ্কা পর্য্যন্ত যেখানে ইচ্ছা তুমি বিহার করিবে। দেবী, গন্ধর্ব্বী মানবী কেহ কখনও যে সুখ ভোগ করে নাই, তুমি তাহার অধিকারিণী হইবে! বনচারী দরিদ্র রাম তোমার ন্যায় নারীরত্নের আদর কিরূপে করিবে? তুমি এই ভুবনমোহিনী লঙ্কাপুরীর অধিশ্বরী হইবার যোগ্যা।”

দাসীগণ এই সময় রাবণের ইঙ্গিতে তাহাদিগের আনীত বস্ত্রালঙ্কার, গন্ধদ্রব্য এবং উৎকৃষ্ট খাদ্য, পানীয় সমূহ সীতাদেবীর সম্মুখে স্তূপাকারে রাখিয়া দিল। স্বর্ণাধারস্থিত রত্নরাজির উপর দীপালোক পতিত হওয়াতে তাহা অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকীর্ণ

করিতে লাগিল; কিন্তু সীতাদেবী সেদিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন না। তখন রাবণ, তাঁহার আসনের সম্মুখে মস্তক নত করিয়া, হস্তদ্বারা তাঁহার পদযুগল ধারণের চেষ্টা করিল। দেখিয়া সীতাদেবী সেখান হইতে সরিয়া বসিলেন এবং রাবণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন; "মূঢ়! তুমি আমায় ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছ? কিন্তু আমার স্বামীর পদের একটী ধূলিকণা আমি তোমার সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ বলিয়া মনে করি। আমার স্বামী বনচারী হউন আর সিংহাসনস্থ হউন, তিনি আমার দেবতা; স্বপ্নেও কখন তাঁহাকে ভিন্ন অপর কাহাকেও আমি চিন্তা করি নাই। তোমার পাপ সংকল্প ত্যাগ কর; সতীর সতীত্ব নাশের অপেক্ষা পৃথিবীতে আর অধর্ম্ম নাই। কেন এ অধর্ম্মের আচরণ করিয়া নিজের সর্ব্বনাশে উদ্যত হইয়াছ?"

রাবণ বলিল; "আমরা রাক্ষস, বলে পত্নীগ্রহণই আমাদিগের ধর্ম্ম, সুতরাং তোমাকে বলে গ্রহণ করাতে আমার কোন অধর্ম্ম হয় নাই। আর তুমি যে বারংবার তোমার স্বামীর গর্ব্ব কর, আমি ত তাহাকে কীটের অপেক্ষা তুচ্ছ মনে করি। আমি ইঙ্গিত করিলে প্রভাতের পূর্ব্বেই তাহার মুণ্ড তোমার পদতলে লুণ্ঠিত হইতে পারে। যদি তোমার স্বামীর প্রতি তোমার যথার্থ মমতা থাকে, তবে, তাহার প্রাণরক্ষার জন্য, আমার বশীভূতা হও। আমি তোমার প্রীতির জন্য তাহাকে প্রাণে বধ করিব না।"

শ্রবণ মাত্র সীতাদেবীর হৃদয় যেন অগ্নিময় হইয়া উঠিল। সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল, নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হইল। তিনি ক্রোধোদ্দীপ্ত বচনে বলিলেন;

"পাপিষ্ঠ! তোমার মত নির্লজ্জ পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই;

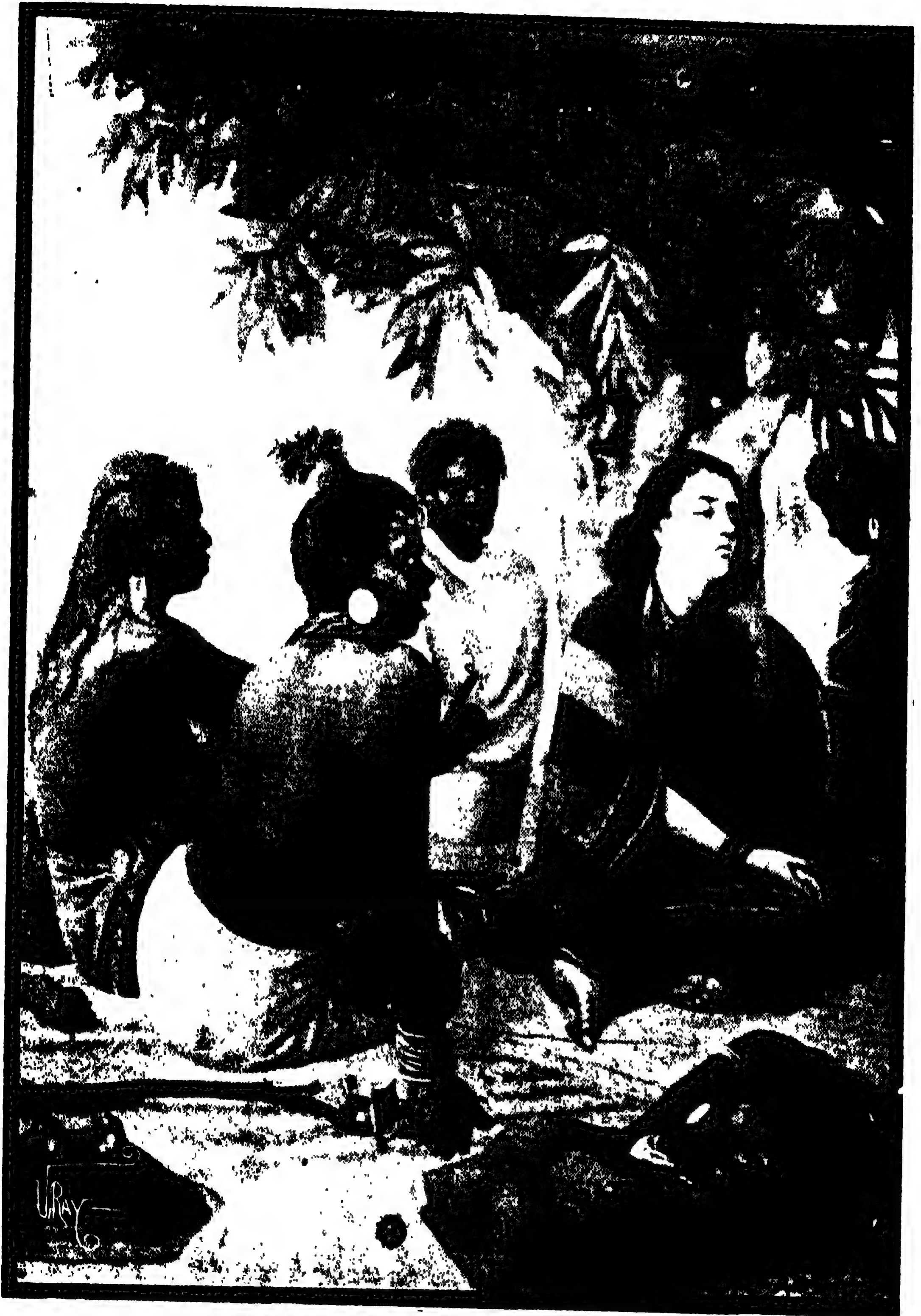
তুমি এই নারীগণের সম্মুখে গর্ব্ব করিয়া বলিতেছ যে, তুমি আমাকে বলে হরণ করিয়াছ? তোমার কি মনে হইতেছে না যে, লোভী কুক্কুর যেমন গোপনে যজ্ঞীয় স্রুক্ মুখে লইয়া পলায়ন করে, তুমি তেমনি আমার স্বামীর অসাক্ষাতে আমায় লইয়া পলায়ন করিয়াছিলে? একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিতেও তোমার সাহস হয় নাই। তুমি বলিতেছ, তুমি অনুকম্পা করিয়া আমার স্বামীকে প্রাণে বধ করিতেছ না, কিন্তু, পাপিষ্ঠ! যে দিন আমার স্বামীর সুতীক্ষ্ণ শর তোমার বক্ষের শোণিত পান করিবে, সেই দিন তুমি বুঝিবে যে, রাজা জনক পুরুষসিংহের হস্তে কন্যাদান করিয়াছিলেন; আর তুমি কুক্কুর হইয়া সিংহীর প্রতি লোভ করিয়াছিলে।”

রাবণ মদ্যপানে উত্তেজিত হইয়া সীতাদেবীর নিকটে আসিয়াছিল; স্ত্রীগণের সম্মুখে এরূপ তিরস্কারে ধৈর্য্যচ্যুত হইল। তাহার চক্ষু আরক্ত হইল; শরীর ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল; সে, নিজের অধর দংশন করিয়া, আপনার কটিবন্ধস্থিত অসি কোষমুক্ত করিবার জন্য উদ্যোগী হইল। তাহার ভাব দেখিয়া তাহার মহিষীগণ ও চেড়ীগণ শঙ্কিতা হইল; কিন্তু সীতাদেবী তাহাকে দেখিয়া বিন্দুমাত্রও ভীতা হইলেন না, এক পদও পশ্চাৎ-বর্ত্তিনী হইলেন না। তিনি বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার চক্ষু দুইটী হইতে যেন দুইটী প্রচণ্ড অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। তিনি একবার ঊর্দ্ধনেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন; অনিমেষ নয়নে কি যেন দেখিয়া তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি অনুচ্চস্বরে একবার বলিলেন, “মা! এসেছ?” তাহার পর আপনার স্বাভাবিক মধুর অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে রাবণের দিকে চাহিয়া বলিলেন; “কাপুরুষ! তুই আপনাকে বীর বলিয়া

গর্ব্ব করিস্ ; অসহায়া নারীর প্রতি এইরূপ ব্যবহারে কি তোর বীরত্ব? তুই আমাকে অসহায়া মনে করিতেছিস্, কিন্তু আমি অসহায়া নই। লঙ্কাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী, সতীশিরোমণি দেবী চণ্ডিকা আমার সহায়। এই দেখ্ তিনি আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা ; এই দেখ্ তাঁহার হস্তের খড়্গ বিদ্যুৎপ্রভায় ঝলসিত হইতেছে, তোর বক্ষের উপর পতিত হইবার পূর্ব্বে এস্থান ত্যাগ কর্।"

সতীর তেজ-প্রদীপ্তমূর্ত্তি দর্শনে রাবণ স্তম্ভিত হইল। তিনি যেদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, একবার বিস্ময়ে সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না, অথচ যেন কোন দৈবশক্তি তাহার সর্ব্বাঙ্গ নিশ্চল করিল ; এই সময় ধান্যমালিনী নামে রাবণের এক পত্নী, পশ্চাৎ হইতে আসিয়া, তাহার অসি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিল এবং তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল ; "মহারাজ! আপনি এ কি করিতেছেন? ত্রিভুবনবিজয়ী বীর হইয়া নারীর দেহে অস্ত্রাঘাত করিতে যাইতেছেন? শুনিলে লোকে কি বলিবে? সীতা মানুষী, সে আপনার মহিমা ও বীর্য্য কি বুঝিবে? আপনাকে দেখিয়া সে ভয়ে কম্পিতা হইতেছে ; আপনার স্পর্শমাত্র হয় ত সে প্রাণত্যাগ করিবে। আপনি চলুন, আমরা আপনার প্রীতিসম্পাদন করিব।"

শুনিয়া রাবণ কোপ ত্যাগ করিল এবং সীতাদেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিল ; "রূপাভিমানিনি! তোমার সহিত আমার প্রতিজ্ঞা ছিল যে, আমি তোমায় এক বৎসর সময় দিব ; তাহার দশমাস গত হইয়াছে, আর দুইমাস মাত্র সময় আছে। ইহার মধ্যে তুমি আমার বশীভূতা না হও আমার সূদগণ তোমাকে আমার প্রাতরাশের জন্য খণ্ড খণ্ড করিবে। জীবিতাবস্থায় তোমাকে ভোগ করিতে না পাই, তোমার মৃতদেহের রক্ত, মাংস ভোগ করিয়া তৃপ্ত হইব।"



অশোকবনে রাক্ষসী পরিবেষ্টিতা সীতাদেবী।

সীতা ৭৫ পৃষ্ঠা।

রাবণ এই বলিয়া নিজের প্রাসাদাভিমুখে প্রস্থান করিল। তাঁহার সঙ্গিনীগণও অনেকে তাহার অনুবর্ত্তিনী হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রাবণ প্রস্থান করিলে তাহার পত্নী ও অনুচরীগণের মধ্যে যাহারা সেখানে রহিল, তাহারা সীতাদেবীকে বেষ্টন করিয়া বসিল। কেহ উপহাসসূচক স্বরে, কেহ বা পরুষ বচনে, কেহ বা মধুর ভাষায় তাঁহাকে নানা কথা বলিতে লাগিল। একজন বলিল ;—

"আহা কি সতীপণাই দেখাইতেছেন! আর কাহারও ত স্বামী থাকে না, আর কেহ ত স্বামী লইয়া ঘর সংসার করে না? যথেষ্ট হইয়াছে; আর কেন? এখন মানে মানে আদরিণী হয়ে থাকুন, নচেৎ ধর্ম্মও যাবে, প্রাণও যাবে। ধান্যমালিনী না থাক্‌লে এতক্ষণে ত সব শেষ হ'য়ে যেত।"

আর একজন বলিল, "সীতে! তুমি কি বিশ্বাস কর যে, তোমার স্বামী এসে তোমাকে উদ্ধার কর্‌বেন? এই অকূল সমুদ্র, এই পার্ব্বত্য দুর্গ, এথান হ'তে তোমাকে উদ্ধার করা দেবতাদেরও সাধ্য নয়, মানুষ কোন ছার! রাক্ষসরাজের বশীভূতা হও, অকারণ কষ্ট পাও কেন?"

তৃতীয়া একজন মৃদুস্বরে বলিল, "জানকি! আমিও তোমার মত মানুষী, কাশী আমার পিতৃভূমি; তোমার পিতার সঙ্গে আমার পিতার পরিচয় আছে। বানপ্রস্থাশ্রমস্থিত আমার বৃদ্ধ স্বামীর নিকট হ'তে রাক্ষসরাজ আমায় হরণ করে এনেছিলেন। নিরুপায়ে এখন আমি তাঁর পত্নীত্ব স্বীকার করেছি। তুমি তাঁর বশীভূতা

তুমি আমার প্রভুর নিকট হইতে আসিয়াছ, তাঁহার কুশল সংবাদ বল।”

হনুমান তখন একে, একে মায়ামৃগের অনুসরণ হইতে রামচন্দ্রের শূন্য কুটীরে প্রত্যাগমন, নানাস্থানে অন্বেষণের পর জটায়ুর মুখে রাবণকর্ত্তৃক সীতাহরণবৃত্তান্ত শ্রবণ, সুগ্রীবের সহিত সখ্য স্থাপন, বালিবধ, সীতার অন্বেষণে সুগ্রীব কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ এবং অবশেষে নিজের সমুদ্র উত্তরণ ও লঙ্কায় আগমন আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। সীতাদেবী শুনিয়া সজল নয়নে বলিলেন, “বৎস! প্রভু কত দিনে লঙ্কায় আসিবেন বলিয়া মনে হয়?”

হনুমান বলিলেন; “আমি প্রতিগমন করিয়া সংবাদ দিলেই তিনি আসিবেন। রাবণ যে দুইমাস আপনাকে সময় দিয়াছে, সেই দুই মাসের মধ্যেই আপনার উদ্ধার হইবে। কিন্তু মা! আপনাকে ছাড়িয়া যাইতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। রাবণের সহিত আজ আপনার যে কথোপকথন হইয়াছিল, আমি তাহা সমস্তই শুনিয়াছি। এই দুর্ব্বৃত্তের নিকট আপনাকে একাকিনী রাখিয়া যাইতে আমার আশঙ্কা হইতেছে। আপনি অনুমতি করুন, আমি আপনাকে স্কন্ধে লইয়া প্রস্থান করি। আমি যে দুর্গম পথে আসিয়াছি, সে পথে কেহ আমার অনুসরণ করিতে পারিবে না। আমি অনায়াসেই আপনাকে লইয়া কোন নিরাপদ স্থানে পঁহুছিতে পারিব।”

সীতাদেবী বলিলেন “বৎস! তোমার সঙ্গে পলায়ন আমার কর্ত্তব্য নয়; আমার প্রভু আমাকে উদ্ধার করিলে তাঁহারও গৌরব আমারও গৌরব। তুমি পুত্রস্থানীয় হইলেও তোমার অঙ্গ স্পর্শ করা আমার পক্ষে উপযুক্ত হইবে না। আমার জন্য চিন্তা

করিও না। আমার মৃত্যুর পর রাবণ আমার রক্ত, মাংস ভোগ করিতে পারিবে, কিন্তু জীবন থাকিতে আমার দেহ ভোগ করিতে পারিবে না। তুমি আমার এই অভিজ্ঞানমণি লইয়া যাও; প্রভুর চরণে দিয়া বলিও, সীতা তাঁহার দর্শনের অপেক্ষায় প্রাণ রাখিয়াছে। দুই মাসের মধ্যে তাহার উদ্ধার না হইলে সে রাবণের ভক্ষ্য হইবে।”

হনুমান সীতাদেবীর চরণে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সীতাদেবী হনুমানকে যেরূপ সুশীল বালকটীর মত দেখিয়াছিলেন, হনুমান বাস্তবিক সেরূপ সুশীল বালক ছিলেন না। হনুমান সীতাদেবীর নিকট বিদায় লইবার পর ভাবিলেন, “প্রভুর আগমনের এখনও ত বিলম্ব আছে; এই রাক্ষসাধম ও তাহার পরিজনেরা আজ মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, বার বার সেরূপ করিলে ত তাঁহার প্রাণ থাকিবে না। ইহা নিবারণের একটী উপায় করিতেই হইবে। রাবণ বুঝুক যে, রামচন্দ্র দূরে থাকুন, তাঁহার দূতের হস্তেই নিস্তার নাই। কিন্তু আমি একা, রাক্ষসেরা অসংখ্য।” হনুমান কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন; “ভাল! দেখি; প্রভুর দয়ায় কি করিতে পারি।”

হনুমান এই ভাবিয়া প্রথমেই রাবণের সুন্দর উপবন নষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। কোন বৃক্ষ সমূলে উৎপাটন, কোন বৃক্ষের শাখাভঞ্জন, কোন বৃক্ষের কাণ্ডবিদারণ হইতে অল্পক্ষণের মধ্যেই উপবন শোভা শূন্য হইল। তুমুল শব্দে প্রহরিণীগণ জাগ্রতা হইয়া দেখিল এক বিকৃতদর্শন, উলঙ্গপ্রায় পুরুষ উপবন উচ্ছিন্ন

করিতেছে। তাহারা তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহস না করিয়া রক্ষকদিগকে সংবাদ দিল। তখন চন্দ্রমা অস্তমিত হইয়াছিলেন, রাক্ষসেরা সুস্নিগ্ধপ্রভাতবায়ুস্পর্শে নিদ্রাসুখভোগ করিতেছিল ; স্বপ্নজড়িত নেত্রে, অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক, আসিয়া হনূমানকে বেষ্টন করিল। কিন্তু অন্ধকারে তাহাদিগের অস্ত্র হনূমানের দেহে পতিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি একটী লৌহস্তম্ভ উৎপাটন করিয়া তাহাদিগের মধ্যে লম্ফ দিয়া পড়িলেন এবং তাহার আঘাতে রক্ষকদলকে সমূলে নিঃশেষ করিলেন। তাহাদিগের মধ্যে রাবণের কয়েকজন প্রধান সৈনিক ও তাহার একটী তরুণ বয়স্ক পুত্রও নিহত হইল। ক্রমে প্রভাতের সঙ্গে অসংখ্য রাক্ষস আসিয়া হনূমানকে বেষ্টন করিল। রাবণের জ্যেষ্ঠ পুত্র অদ্বিতীয় বীর ইন্দ্রজিতও এই সময় আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। দেখিয়া হনূমান ভাবিলেন, কৌশল অবলম্বন ভিন্ন এ অবস্থায় উদ্ধারের পথ নাই। তিনি ইন্দ্রজিতের অস্ত্রাঘাতে মূর্চ্ছার ভান করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। রাক্ষসেরা আসিয়া তাঁহাকে বন্ধন করিয়া রাবণের নিকট লইয়া চলিল। রাবণ তাঁহার পরিচয় পাইয়া কোপে, প্রথমে, তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিল। তাহার পর দূত অবধ্য বুঝিয়া তাঁহাকে কোনরূপ কঠোর শাস্তিদানের পর ছাড়িয়া দিবার আদেশ দিল। স্বভাবনিষ্ঠুর রাক্ষসগণ, কৌতুক দেখিবার জন্য, হনূমানের অঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া তাহাতে ঘৃত ও তৈল লেপন পূর্ব্বক অগ্নিদান করিল। হনূমান এইরূপই একটী সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। তাঁহাকে অস্ত্রাঘাতে মৃতকল্প ও চলৎশক্তিরহিত ভাবিয়া রাক্ষসেরা অসতর্ক ছিল। দেখিয়া হনূমান এক লম্ফে সমীপবর্ত্তী একটী গৃহের উপর উঠিলেন এবং তাঁহার অগ্নিস্পৃষ্ট আচ্ছাদন-বস্ত্র উন্মোচন পূর্ব্বক হস্তে লইয়া গৃহে গৃহে ভ্রমণ

করিতে লাগিলেন। যেখানেই তিনি কোন দাহ্য পদার্থ দেখিলেন, তাহাতেই তিনি অগ্নিসংযোগ করিলেন। উল্লম্ফনে ও গতিবেগে রাক্ষসগণের কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না; মহাবেগে ভ্রমণ করিয়া তিনি, ক্রমে, লঙ্কাপুরীতে প্রলয়ানল উদ্দীপন করিলেন। প্রাসাদ, বিপনী, নাট্যশালা, দেবায়তন দগ্ধ হওয়াতে লঙ্কাপুরী প্রহরকাল অতীত হইতে না হইতে শ্রীভ্রষ্ট হইল। শত শত স্ত্রীপুরুষ এবং সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি পালিত জন্তু অগ্নিদগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। লঙ্কাপুরীতে তুমুল কোলাহল ও আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। সেই লোমহর্ষণ ব্যাপারের মধ্যে হনূমান যে দুর্গম পথ দিয়া আসিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়া অদৃশ্য হইলেন।

হনূমান নির্ব্বিঘ্নে লঙ্কাপুরী হইতে কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার মুখে সীতাদেবীর সংবাদ পাইয়া রামচন্দ্র অগণ্য বানরবাহিনী সহ লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং তাহাদিগের সাহায্যে সমুদ্রে এক মহাসেতু বন্ধন করিলেন। এদিকে হনূমান যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। তাঁহার বীরত্ব ও কৌশল দর্শনে রাক্ষস, রাক্ষসীরা সন্ত্রস্ত হইল। রাবণ ভাবিয়াছিল, রামচন্দ্র সীতাদেবীর সংবাদ পাইবেন না; পাইলেও দুর্গম লঙ্কাপুরী হইতে তাঁহার উদ্ধারের কোন চেষ্টা করিবেন না। কিন্তু হনূমানের কার্য্যে রাবণের হৃদয় ভীতিগ্রস্ত হইল। সে সীতাদেবীকে পূর্ব্ববৎ উত্ত্যক্ত করিতে নিরস্ত হইল। ত্রিজটা নাম্নী এক রাক্ষসী পূর্ব্ব হইতেই সীতাদেবীর গুণপক্ষপাতিনী ছিল, এই হইতে সে অন্য রাক্ষসীদিগকে তাঁহার প্রতি সদয় ব্যবহারের জন্য উপদেশ দিতে লাগিল। একদিন প্রভাতে ত্রিজটা আসিয়া সীতাদেবীকে বলিল "সতি! তোমার উদ্ধার নিকটবর্ত্তী; আমি গত রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তোমার স্বামী তোমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন; সে স্বপ্ন সত্য

হইয়াছে। রামচন্দ্র, সমুদ্রে মহাসেতু বন্ধন করিয়া, অগণ্য সৈনিকসহ লঙ্কার পশ্চিম দ্বার অবরোধ করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার সৈনিক-দিগের বাসের জন্য নির্ম্মিত পর্ণশালায় সমুদ্রকূল আবৃত হইয়াছে। অই শুন, তোমার স্বামীর জয়শব্দ, সমুদ্রগর্জ্জনকেও পরাজয় করিয়া, এখান হইতে শ্রুত হইতেছে। এই সময় সহস্র সহস্র কণ্ঠ হইতে সমুত্থিত "জয় রামচন্দ্রের জয়" "জয় প্রভু রঘুনাথের জয়" সীতাদেবীর কর্ণে প্রবেশ করিল। আষাঢ়ের প্রথম মেঘগর্জ্জন শ্রবণ করিলে ময়ূরী যেমন উল্লসিতা হয়, সেই শব্দ শ্রবণে সীতাদেবীও তেমনি উল্লসিতা হইলেন। তাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত, বক্ষ স্ফীত এবং নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। তিনি করযোড়ে পতিকুল-দেবতা-দিগকে প্রণাম করিলেন।

তাহার পর যাহা হইল, তাহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণনার প্রয়োজন নাই। কারণ তাহার সহিত সীতাদেবীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ অল্প। রামচন্দ্রের সহিত রাক্ষসরাজের তুমুল সংগ্রাম আরব্ধ হইল। দিনের পর দিন যুদ্ধ চলিতে লাগিল। রণভূমি মৃতদেহে দুর্দ্দর্শনীয় এবং শোণিতপাতে পঙ্কিল হইল। প্রধান প্রধান রাক্ষস বীরগণ একে একে নিহত হইতে লাগিল। অসংখ্য রাক্ষস-সৈনিক মহাবীর হনূমানের হস্তে প্রাণত্যাগ করিল। লঙ্কাপুরী পুত্রহীনা মাতার এবং পতিহীনা রমণীর করুণ ক্রন্দনে পূর্ণ হইল এবং চিতাধূম নিবিড় কুজ্ঝটিকার ন্যায় তাহা সমাবৃত করিল। রাবণ আত্মকৃত কার্য্যের পরিণাম দেখিয়া দারুণ মর্ম্মপীড়া ভোগ করিতে লাগিল। কাহারও নিকট সহানুভূতি লাভের তাহার আশা ছিল না, কারণ সমস্তই তাহার নিজের দুষ্কৃতির ফল। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধার্ম্মিক বিভীষণ তাহাকে ত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন। তাহার মধ্যম ভ্রাতা, অদ্বিতীয়

বলশালী কুম্ভকর্ণ, তাহাকে বহু অনুযোগ করিলেন এবং অবশেষে ভ্রাতার অনুরোধে যুদ্ধে গিয়া রামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইলেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ইন্দ্রজিৎ, সমরে অজেয় বলিয়া গণিত ছিলেন, কিন্তু তিনিও লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। রাক্ষসরাজের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না; কিন্তু এ অবস্থাতেও সীতা প্রত্যর্পণে তাহার ইচ্ছা হইল না। ইন্দ্রিয়-লালসার অপেক্ষা লোকলজ্জাই তখন প্রবল অন্তরায় হইল। শোকে ও ক্ষোভে পীড়িত হইয়া রাবণ এক দিনের যুদ্ধে লক্ষ্মণকে নিদারুণ শক্তিশেল দ্বারা আঘাত করিল, কিন্তু বীরবর হনুমান দুর্লভ ঔষধ সংগ্রহ করিয়া লক্ষ্মণের প্রাণরক্ষা করিলেন। অবশেষে ঘোরতর সংগ্রামের পর রাক্ষসরাজ রামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইল। সতীর অবমাননার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইল। ধনবল, জনবল, বাহুবল কিছুই যে পাপীকে বিধাতার ন্যায়দণ্ড হইতে রক্ষা করিতে পারে না, তাহার উজ্জ্বল উদাহরণ দেখাইয়া রাবণ পৃথিবী হইতে অপসৃত হইল।

সীতাদেবী যদিও অশোকবনে বন্দিনীর ন্যায় বাস করিতে ছিলেন, তথাপি যুদ্ধের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি তাঁহার অবিদিত ছিল না। বিভীষণ-পত্নী সরমা এবং ত্রিজটা আসিয়া, মধ্যে, মধ্যে তাঁহাকে যুদ্ধের সংবাদ প্রদান করিতেন। অধিকাংশ দিনই তিনি রামচন্দ্রের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণে হরষিতা হইতেন, কিন্তু যে দিন রাক্ষসদিগের জয়ধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইত, সে দিন তাঁহার চিন্তার ও উদ্বেগের সীমা থাকিত না। অবশেষে একদিন তিনি শ্রবণ করিলেন যে, তাঁহার সকল দুঃখের মূল রাবণ যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। তাঁহার হৃদয় হইতে যেন পর্ব্বত-প্রমাণ ভার অপসারিত হইল। তিনি শান্তিলাভ করিলেন; কিন্তু সেই সঙ্গে লঙ্কাপুরীর

দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া, এবং কত নিরপরাধ শিশু পিতৃহীন, কত বৎসলা মাতা পুত্রহীনা, কত পূতহৃদয়া সতী পতিহীনা হইলেন ভাবিয়া তাঁহার কোমল হৃদয় ব্যথিত হইল।

রাবণবধের সঙ্গে সীতাদেবী ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার দুঃখের অবসান হইবে, কিন্তু তাহা হইল না। বৈশাখের প্রখর রৌদ্রের পর, সুস্নিগ্ধ ধারাপাতের সঙ্গে, কিরূপ বিশ্বদাহী বজ্রাগ্নি পতিত হয়, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা তাহা দেখিতে পাইব।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধজয়ের পর রামচন্দ্র সীতাদেবীকে আনয়নের জন্য বিভীষণকে প্রেরণ করিলেন। সীতাদেবীর ইচ্ছা ছিল যে, তিনি যে অবস্থায় অশোকবনে বাস করিতেছিলেন সেই অবস্থাতেই রামচন্দ্রকে দর্শন করিবেন। কিন্তু বিভীষণ, তাঁহার অনিচ্ছা সত্বেও, তাঁহাকে রামচন্দ্রের অভিপ্রায় জানাইয়া, উৎকৃষ্ট অঙ্গরাগে এবং মনোহর বসন ভূষণে সুসজ্জিতা করিয়া তাঁহাকে রামচন্দ্রের সমীপে আনয়ন করিলেন। সেই দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর, সেরূপ মর্ম্মভেদী যন্ত্রণানুভবের পর, উভয়ে পরস্পরকে দেখিয়া কতই সুখী হইবেন ভাবিয়াছিলেন। উভয়েই কল্পনায় কতই সুখের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ সমস্তই বিলুপ্ত হইল। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, সুখভোগের জন্য সীতাদেবীর জন্ম নয়। লঙ্কাবিজয়ী, আনন্দোৎফুল্ল বীরগণের মধ্যে সভাস্থলে সীতাদেবী শিবিকা হইতে অবতীর্ণা হইলেন; যেন ভূতলে শরীরিণী বিদ্যুল্লতা দৃষ্ট হইল। কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াই রামচন্দ্রের মনে কি জানি কি ভাবান্তর হইল। যাঁহার জন্য তিনি অনিদ্রায়, অনাহারে, দেশে দেশে,

উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিয়াছিলেন, যাঁহার জন্য তিনি রণক্ষেত্রে অজস্রধারে দেহের শোণিতপাত করিয়াছিলেন, যাঁহার মূর্ত্তি অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে হৃদয়মন্দিরে স্থাপন করিয়া তিনি পূজা করিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া তিনি, নির্ম্মমের ন্যায়, পরুষবচনে বলিলেন ;

"ভদ্রে! বহু ক্লেশের পর আমি তোমায় উদ্ধার করিয়াছি। রঘুবংশের গৌরব, আমার পৌরুষ রক্ষা হইয়াছে, এবং তোমার প্রতি আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন হইয়াছে। কিন্তু তুমি একাকিনী এতদিন রাবণগৃহে বাস করিয়াছিলে ; রাবণ মায়াবী, বলবান এবং অসংযতেন্দ্রিয়। তাহার গৃহে এতদিন একাকিনী অবস্থিতির পর তোমাকে গ্রহণ করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি, তুমি এক্ষণে যথেচ্ছ গমন ও যথেচ্ছ জীবন যাপন করিতে পার।"

হায়! ইহার অপেক্ষা সীতাদেবীর মস্তকে অশনিপাত হইল না কেন? পৃথিবী বিদীর্ণা হইয়া তাঁহাকে গ্রাস করিলেন না কেন? তিনি কি উত্তর দিবেন? জাগ্রতে, স্বপ্নে যাঁহার কথা ভিন্ন তাঁহার অন্য চিন্তা ছিল না, লঙ্কাপুরীর সমুদ্রতট হইতে বায়ু আসিলে এই বায়ু আমার প্রভুর দেহ স্পৃষ্ট হইয়া আসিতেছে ভাবিয়া যিনি আদরে তাহা আলিঙ্গন করিতেন, সেই রামচন্দ্র তাঁহার প্রতি এইরূপ উক্তি করিলেন! "যথেচ্ছ গমন", "যথেচ্ছ জীবনযাপন" পতির মুখে পত্নীর সম্বন্ধে ইহার অপেক্ষা আর কঠোরতর বাক্য কি হইতে পারে? তাঁহার হৃদয় যেন মথিত হইয়া গেল। তিনি নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মানা রহিলেন। রামচন্দ্র কিরূপে সীতাদেবীর সম্বর্দ্ধনা করেন দেখিবার জন্য হনুমান ও লক্ষ্মণ উৎসুক ছিলেন ; রামচন্দ্রের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারাও নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দ হইলেন। সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তির শক্তি রহিল

না। সীতাদেবী একবার রামচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিলেন, তাঁহার সেই চিরারাধ্য ধন তাঁহার প্রতি এরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন, সে মুখ দর্শনে তাহা তাঁহার বিশ্বাস হইল না। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার ভ্রম হইয়াছে কিন্তু পরক্ষণেই তিনি শুনিতে পাইলেন রামচন্দ্র বলিতেছেন ;

"সীতে ! যে স্ত্রী অসচ্চরিত্র পরপুরুষের গৃহে দীর্ঘকাল বাস করে, কোনও তেজস্বী পুরুষ তাহাকে গ্রহণ করিতে পারেন না ? নেত্ররোগগ্রস্ত ব্যক্তির সম্মুখস্থ দীপশিখা যেমন তাহার চক্ষুর যন্ত্রণা উৎপন্ন করে, তুমিও তেমনই আমার সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিয়া আমার অন্তর দগ্ধ করিতেছ। তোমার প্রতি আমার যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহা করিয়াছি, তোমাতে আমার আর প্রয়োজন নাই ; তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর।"

পতির মর্য্যাদারক্ষা সতীর অবশ্য কর্ত্তব্য ; কিন্তু পতি যদি তাঁহার পাতিব্রত্য সম্বন্ধে সন্দিহান হন, তবে আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য, সময় বিশেষে, সতীকে পতির কথার প্রতিবাদ করিতে হয়। সীতাদেবীর পক্ষে এখন সেই সময় উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি বস্ত্রাঞ্চলে আপনার চক্ষু মার্জ্জনা করিলেন, এবং যথোচিত ধৈর্য্য সংগ্রহ পূর্ব্বক বলিলেন ;

বীর ! ইতর জন অনার্য্যা রমণীর প্রতি যে বাক্য প্রয়োগ করে, আপনি আমার প্রতি সেইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন কেন ? রাবণ বলপূর্ব্বক আমাকে গ্রহণ করিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল সত্য, আমি দুর্ব্বলা নারী, রক্ষক না থাকায় সে আমায় তাহার রথে আরোপণ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাতে আমার অপরাধ কি ? আমার দেহ আমার আয়ত্ত নয়, সুতরাং তাহা রাবণের স্পর্শ হইতে আমি রক্ষা করিতে পারি নাই, কিন্তু যাহা

আমার আয়ত্ত অর্থাৎ আমার হৃদয় তাহাত কেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই, তাহা একমাত্র আপনাতেই অনুরাগী রহিয়াছে। আমার আবাল্যপ্রকৃতি এবং আপনার প্রতি আমার ভক্তি ও অনুরাগ আপনি বিবেচনা করিলেন না ?"

বলিতে বলিতে সীতাদেবীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে লক্ষ্মণকে বলিলেন ;

বৎস লক্ষ্মণ! এরূপ অপবাদগ্রস্তা ও অপমানিতা হইয়া আমি আর প্রাণধারণ করিতে ইচ্ছা করি না। অনলে আমার সতীধর্ম্মের পরীক্ষা হউক, তুমি আমার জন্য অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত কর।"

সীতাদেবীর প্রতি রামচন্দ্রের ব্যবহার দর্শন করিয়া লক্ষ্মণ ক্রোধে, বার বার, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে ছিলেন। তিনি তাঁহার কথা শুনিয়া রামচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাঁহার মুখভঙ্গী হইতে বুঝিলেন যে, সেই কঠোর পরীক্ষা রামচন্দ্রের অনভিপ্রেত নয়। তখন, অল্পক্ষণের মধ্যে, লঙ্কার সমুদ্রকূলে এক বিশাল অগ্নিকুণ্ড রচিত হইল। শুষ্ক কাষ্ঠ, ঘৃত ও সর্জ্জরস ইত্যাদি দাহ্য পদার্থের যোগে তাহাতে অল্পক্ষণের মধ্যেই হুতাশন লেলিহান জিহ্বা প্রসারিত করিতে লাগিলেন। সমবেত জনমণ্ডলী, কুণ্ড পরিবেষ্টন করিয়া, চিত্রার্পিতের ন্যায় সে দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। কাহারও মুখে বাক্য মাত্র রহিল না, কিন্তু সহস্র সহস্র নয়ন হইতে নীরবে অশ্রুবিন্দু পতিত হইতে লাগিল এবং সহস্র সহস্র দীর্ঘনিশ্বাসে অগ্নিশিখা চঞ্চল হইয়া উঠিল। কেবল তিনজনের মুখে কোন বিষাদলক্ষণ লক্ষিত হইল না। প্রথম রামচন্দ্রের, দ্বিতীয় লক্ষ্মণের, তৃতীয় হনুমানের। রামচন্দ্র একবারেই বিকারশূন্য, তাঁহার মুখে হর্ষ, উদ্বেগ, চিন্তা কিছুই নাই, উদাসীনের ন্যায় তিনি অগ্নিপরীক্ষার আয়োজন দেখিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণের মুখে উৎকণ্ঠার অপেক্ষা ক্রোধের ভাবই অধিক সূচিত হইল। হনূমান, স্থির গম্ভীর ভাবে, শুষ্ক কাষ্ঠ আনিয়া কুণ্ড সাজাইতে ছিলেন; তাঁহার মুখে যেন তাচ্ছীল্যের ভাব ব্যক্ত হইতেছিল। তিনি অনুচ্চস্বরে বলিতে ছিলেন, "প্রভো! এ পরীক্ষা কাহার জন্য? আপনার নিজের বিশ্বাসের জন্য না জনতার সন্তোষের জন্য? সূর্য্যালোককে কি দীপালোক-পাতে উজ্জ্বল করিতে হইবে, না অমৃতকে শর্করা-সংযোগে মধুর করিতে হইবে? ভাল! পরীক্ষা হউক; পৃথিবী দেখুক, আধ্যাত্মিক শক্তি আধিভৌতিক শক্তিকে পরাজয় করিতে পারে কি না।"

সীতাদেবী ধীর অথচ দৃঢ় পদে অগ্নিকুণ্ডের দিকে অগ্রসর হইলেন। একবার ঊর্দ্ধনেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া রঘুকুল-দেবতা সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিলেন। তাহার পর রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া জনতার দিকে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিলেন। একই শক্তির বলে পরিচালিত যন্ত্রাঙ্গের ন্যায় সমবেত জনমণ্ডলী, মস্তক অবনত করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি, অগ্নিদেবকে প্রণাম করিয়া সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তাহার পর ব্রতনিষ্ঠা তপস্বিনী যেমন সমাধির জন্য আপনার আসন গ্রহণ করেন, সেইরূপ গিয়া অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে উপবেশন করিলেন। অগ্নির প্রচণ্ড জ্বালায় ও ধূমে তাঁহার মূর্ত্তি অল্পক্ষণের মধ্যেই অদৃশ্য হইল। সাধারণে ভাবিল ভস্ম ভিন্ন তাঁহার আর কোন চিহ্নই থাকিবে না। তখন কেহ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে, কেহ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে, কেহ বা পরস্পরকে অনুচ্চ স্বরে কি বলিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকেই একটী আকুলতার লক্ষণ লক্ষিত হইল; অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং রামচন্দ্রও বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এ কি! সঞ্চিত কাষ্ঠরাশি দগ্ধ



সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষা। সীতা ৭৫ পৃষ্ঠা।

করিয়া অগ্নি যতই আপনা আপনি ক্ষীণপ্রভ হইয়া আসিতে লাগিলেন, ততই সীতাদেবীর পবিত্র মূর্ত্তি কাঞ্চনপ্রতিমার ন্যায় লোকচক্ষু আকর্ষণ করিতে লাগিল। সতীধর্ম্মের গৌরব রক্ষার জন্য প্রকৃতি যেন আপনার নিয়মের পরিবর্ত্তন করিলেন, পরাজয়েও তাঁহার জয় হইল। লোকে দেখিল, জ্বলদঙ্গার রাশির উপর লোহিত পদ্মাসনা কমলার ন্যায় সীতাদেবী বিরাজমানা আছেন। তাঁহার পরিধেয় বসনের একটী সূত্র, তাঁহার মস্তকের একটী কেশ, তাঁহার দেহের একটী লোমও দগ্ধ হয় নাই। রাক্ষস-বধূগণ তাঁহার কবরী যে পুষ্পদামে এবং তাঁহার কণ্ঠ যে কুসুমমাল্যে সুশোভিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও প্রফুল্ল রহিয়াছে, ধূমসংযোগে এক বিন্দুও মলিন হয় নাই। রামচন্দ্র স্বয়ং অগ্রসর হইয়া দক্ষিণ হস্তে সীতাদেবীর কর ধারণ করিলেন ; দেখিয়া হনূমান আনন্দে তাণ্ডব-নৃত্য আরম্ভ করিলেন। অযুত কণ্ঠে "জয় সতীর জয়" "জয় রামচন্দ্রের জয়" "জয় সীতারামের জয়" ধ্বনিত হইতে লাগিল। নবোদিত সূর্য্যের আলোক আরও উজ্জ্বল হইল ; বায়ু আরও মধুর হিল্লোলে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং লঙ্কার জল, স্থল অপূর্ব্ব সুন্দর কুসুমে সুশোভিত হইল।

কি বলিয়া রামচন্দ্র ও সীতাদেবী পরস্পরের নিকট দীর্ঘ বিরহ-বেদনা ব্যক্ত করিলেন, মায়ামৃগের অনুসরণের দিন হইতে তৎকাল পর্য্যন্ত উভয়ে কোথায়, কি ভাবে জীবনযাপন করিয়াছিলেন, তাহা কিরূপে বর্ণন করিলেন, তাহা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। সহৃদয় পাঠক, পাঠিকা তাহা কল্পনায় অবগত হইবেন। অগ্নিপ্রবেশ সম্বন্ধীয় ঘটনার উল্লেখ করিয়া রামচন্দ্র শতবার সীতাদেবীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু অপরাধ বলিয়া ভাবিলেত ক্ষমা! রামচন্দ্র কোন অপরাধ করিয়া-

ছেন, এ চিন্তা স্বভাবসরলা সীতাদেবীর মনে একবারও উদয় হইল না। নিজের চিরাভ্যস্ত, সপ্রেম বচনে তিনি বলিলেন "নাথ! ক্ষমা কিসের জন্য? এই অগ্নিপরীক্ষায় আপনি সীতার গৌরব বৰ্দ্ধন করিয়াছেন, তবে ক্ষমাপ্রার্থনা কেন?" রামচন্দ্র বলিলেন, "প্রিয়ে! কি বলিব? অন্তরাত্মা ভিন্ন রামের হৃদয় আর কেহ জানে না। প্রথম দর্শনের দিন যেমন ছিলে, চিরদিনই তেমন, এ হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া থাক। সুখে দুঃখে, মিলনে বিরহে, কোমলতায় কঠোরতায় রামের হৃদয়কে কখনও অবিশ্বাস করিও না।"

সীতাদেবী বলিলেন "তাহা আর বলিতে হইবে না।"

চতুৰ্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

লঙ্কাযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে রামচন্দ্রের নির্ব্বাসনকালও শেষ হইয়াছিল। তিনি বিভীষণকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লঙ্কা যুদ্ধের সহচরদিগকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাক্ষসরাজের আকাশগামী পুষ্পকরথ তাঁহাদিগকে লইয়া গগনপথে উত্থিত হইল। রামচন্দ্র অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সীতাদেবীকে পথের পরিচয় দিতে লাগিলেন। যে মহাসেতু দ্বারা তিনি সাগর উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কায় উপনীত হইয়া ছিলেন, নীলাকাশ মধ্যস্থিত ছায়াপথের ন্যায় তাহা শোভা পাইতে ছিল এবং ফেনময় তরঙ্গরাজী তাহার উভয় পার্শ্বে মহাবেগে আঘাত করিতেছিল; প্রথমেই তাহা দেখাইলেন। রথ সমুদ্র অতিক্রম করিয়া উত্তরমুখে ধাবিত হইল; ক্রমে ঋষ্যমূক গিরি পম্পাসরোবর এবং মাল্যবান পর্ব্বত প্রভৃতি যে যে স্থানে তিনি উন্মত্তের ন্যায় সীতাদেবীর অন্বেষণ

করিয়াছিলেন, তাহা নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। গোদাবরীতীরবর্ত্তী যে রমণীয় প্রদেশে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া উভয়ে পরম সুখে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়া ছিলেন, এবং যেখান হইতে রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল ক্রমে তাহা তাঁহাদিগের নেত্রপথে পতিত হইল। দেখিয়া পূর্ব্বকথা স্মরণ হওয়াতে উভয়েরই হৃদয় উচ্ছসিত এবং নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। রথ আরও উত্তর মুখে ধাবিত হইল। উভয়ে মহর্ষি অগস্তের আশ্রম, চিত্রকূট এবং গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম দর্শন করিলেন। প্রিয়সখা গুহককে দর্শনদানে আপ্যায়িত করিয়া রামচন্দ্র ক্রমে অযোধ্যার নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং ভরতকে সংবাদ দিবার জন্য হনূমানকে অগ্রে নন্দীগ্রামে প্রেরণ করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে সে সংবাদ অযোধ্যায় প্রচারিত হইল। বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ, ধনী দরিদ্র, সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, রামচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিতে বহির্গত হইলেন। ভরত, শত্রুঘ্ন, বৃদ্ধা মহিষীগণ এবং বশিষ্ঠ, বামদেব প্রভৃতি ঋষিগণ মিলিত হইয়া রামচন্দ্র ও সীতাদেবীকে আদরে গ্রহণ করিলেন। চীরধারী, জটামণ্ডিত, শুষ্কমূর্ত্তি ভরতের বেশ দর্শন করিয়া রামচন্দ্র অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। শোকাশ্রু আনন্দাশ্রুতে পরিণত হইয়া শত ধারে অযোধ্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। কৈকেয়ীদেবী আত্মকৃত কার্য্যের জন্য মনোদুঃখে ম্রিয়মাণা হইয়াছিলেন, রামচন্দ্র মধুর বচনে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহার সকল ক্লেশ দূর করিলেন। কৌশল্যাদেবী ও সুমিত্রাদেবী হারানিধি প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থা হইলেন; ঊর্ম্মিলার বিশুষ্ক মুখ মধুর হাস্যে আবার সমুজ্জ্বল হইল।

শুভদিনে মহাসমারোহে রামচন্দ্রের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইল। উজ্জ্বল রাজবেশে সুসজ্জিত হইয়া রামচন্দ্র সিংহাসনে উপবেশন করিলেন; বামে সীতাদেবী ভুবনমোহন বেশে আসীনা হইলেন।

যাঁহারা তাঁহাদিগকে রাজসিংহাসনে দর্শন করিলেন, তাঁহারা আপনাদিগের নয়ন সার্থক জ্ঞান করিলেন। ভরত স্বহস্তে ছত্র ধারণ এবং লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। অযোধ্যাবাসীদিগের সকল ক্ষোভ, সকল অভাব দূরীভূত হইল। রামচন্দ্র ধর্ম্মানুসারে অযোধ্যারাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন ; রাম-রাজ্য সুশাসনের উদাহরণ রূপে পরিগণিত হইল। ইহার উপর, কিয়দ্দিনের মধ্যে, সীতাদেবীর গর্ভলক্ষণ লক্ষিত হওয়াতে অযোধ্যা-বাসীদিগের আনন্দের আর সীমা রহিল না। কবে পৌত্রমুখ দর্শন করিবেন এই আনন্দে বৃদ্ধা মহিষীগণ দিন গণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। রামচন্দ্রের ও সীতাদেবীর পরস্পরের প্রতি অনুরাগ যেন আরও ঘনীভূত হইল। অতীতের দুঃখের সহিত তুলনায় বর্ত্তমানের সুখ যেন আরও অধিক মধুর, আরও অধিক প্রগাঢ় বোধ হইতে লাগিল।

কিন্তু, হায়! বিধাতার বিধান কে বুঝিতে পারে? সায়ংকালে পশ্চিমাকাশ যখন বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত হইয়া দর্শকের নয়ন পরিতৃপ্ত করে, তখন সেই বর্ণসম্পাতের অন্তরালে নিবিড় কৃষ্ণ মেঘখণ্ড সঞ্চিত হইতেছে বলিয়া কে সন্দেহ করে? কুসুমকলিকা স্ফুটনোন্মুখ হইয়া যখন মধুর সৌরভে নাসিকা তৃপ্ত করিতে থাকে, তখন বিষকীট যে তাহার অভ্যন্তর জীর্ণ করিতেছে, তাহা কে জানিতে পারে? যখন রামচন্দ্র ও সীতাদেবী, সুখের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া, পিতামাতার ন্যায় স্নেহে অযোধ্যাবাসীদিগকে পালন করিতেছিলেন, তখন কে জানিত যে, তাঁহাদিগের সন্দিগ্ধচিত্ত প্রজাগণ তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে হৃদয়ে তীব্র হলাহল পোষণ করিতেছে? অথবা সে কথাই বা বলি কেন, দুর্জ্জন না থাকিলে সুজনের মহত্ব প্রকাশিত হইবে কিরূপে?

প্রজাগণের সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগ গোপনে অবগত

হইবার জন্য রামচন্দ্র একজন বিশ্বাসী চর নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সে প্রতিদিন আপনার লোকচর্চ্চার ফল রামচন্দ্রকে জ্ঞাপন করিত। প্রতিদিনই নিজের প্রশংসাবাক্য রামচন্দ্রের কর্ণগোচর হইত। এক-দিন তিনি বলিলেন; "দূত! তুমি প্রতিদিনই আমার প্রশংসার কথা বল, কিন্তু আমি কেবল প্রশংসা শুনিবার জন্য ত তোমাকে নিযুক্ত করি নাই; যদি কেহ আমার কোন ভ্রম, কোন ত্রুটী উল্লেখ করে, তবে বল, তোমার নিকট হইতে জানিয়া তাহা সংশোধন করিতে পারিব বলিয়াই আমি তোমায় রাখিয়াছি।"

দূত শুনিয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া, বলিল;—"মহারাজ! আমি আপনার ভৃত্য, আপনার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছি; মহারাজের আদেশপালনই আমার পরম ধর্ম্ম। আমি প্রকৃতই সর্ব্বদা মহারাজের সুখ্যাতি শ্রবণ করি। ক্বচিৎ কোন কোন দিন কোন নিন্দা শ্রবণ করিয়া থাকি। যদি তাহা জানিবার মহারাজের অভিপ্রায় হয়, আমাকে অভয় দান করিলে আমি বলিতে পারি।"

রামচন্দ্র বলিলেন; "তুমি নিশ্চিন্ত মনে বল, আমি নিজেই ত তোমাকে আমার দোষ শুনাইবার জন্য রাখিয়াছি, সুতরাং অপ্রিয় কথা বলিলেও তোমার কোন অপরাধ হইতে পারে না।"

দূত অবনত মস্তকে বলিল; "মহারাজ! প্রজাগণ একবাক্যে আপনার রাজধর্ম্মের প্রশংসা করে। তাহারা বলে, এরূপ সুশৃঙ্খলে রাজ্যশাসন, এরূপ অপক্ষপাত বিচার, এবং প্রজাগণের এরূপ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ইক্ষাকুবংশীয় কোন রাজার সময়ে কখনও হয় নাই। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে অনেকে ইহাও বলে যে, আপনার রাজধর্ম্মের আদর্শ অতি উচ্চ হইলেও পারিবারিক ধর্ম্মের আদর্শ তাদৃশ উচ্চ নয়। কেহ কেহ এতদূর বলে যে, আপনি পারিবারিক জীবনে অতি কুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন।"

রামচন্দ্র চমকিত হইলেন; হৃদয়ের মধ্যে একটী তীব্র জ্বালা অনুভব করিলেন; কিন্তু ভাব গোপন করিয়া বলিলেন;

"দূত! তাহাদিগের এরূপ বলিবার কারণ কি?

দূত বলিল, "কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিয়া তাহা জানিয়াছি। তাহারা বলে, "নারীর চরিত্রের উপর পারিবারিক সুখ ও শান্তি প্রতিষ্টিত। এই জন্য শাস্ত্রকারগণ পুরুষের অপেক্ষা নারীর পবিত্রতা সম্বন্ধে কঠোর দৃষ্টি রাখিয়াছেন এবং সেই জন্য সমাজও নারীর, স্বেচ্ছাকৃত হউক বা অনিচ্ছাকৃত হউক, অপরাধের প্রশ্রয় দিতে পারে না। পুরুষ একাধিক পত্নী গ্রহণ করিলে সমাজে নিন্দনীয় হয় না, কিন্তু নারীর একাধিক পতিগ্রহণ সর্ব্বথা গর্হণীয়। এমন কি নারী যদি পতিগৃহ হইতে একাকিনী দীর্ঘকাল পিতৃগৃহে বাস করে, তাহা হইলেও সে সমাজে নিন্দনীয়া হয় এবং তাহার পতি তাহাকে গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হন। কিন্তু আমাদিগের রাজ-মহিষী দীর্ঘকাল একাকিনী দুর্ব্বৃত্ত রাবণগৃহে বাস করিলেন, অথচ মহারাজ অসঙ্কোচে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন, ইহা কিরূপ ব্যবহার? ইহার দ্বারা কি উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেওয়া হইল না?"

রামচন্দ্র দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, 'রাজমহিষী ত স্বেচ্ছায় রাবণগৃহে বাস করেন নাই, সুতরাং তাঁহার অপরাধ কি?

দূত। "প্রজাগণ বলে যে, যদি কোন ব্যক্তির দেহে তাহার অনিচ্ছায় সংক্রামক ব্যাধির বিষ প্রবিষ্ট হয়, তবে কি তাহার দেহ জীর্ণ হয় না, না তাহার সহিত সংসর্গী ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হয় না? সেইরূপ যদি কোন নারীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার ধর্ম্ম অপহৃত হয়, তবে কি সে পাপভাগিনী হয় না, না তাহার গ্রহীতা স্বামী প্রত্যবায়ভাগী হন না? রাজমহিষী স্বয়ং সুশীলা হইলেও রাবণের নিকট যে ধর্ম্মরক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহা সম্ভব নয়। কারণ

রাবণ একেই অসংযতেন্দ্রিয়, তাহার উপর সে মদিরাসক্ত ও অসীম বলবান। শত শত সতীর ধর্ম্ম অপহরণে তাহার চিত্ত কঠোর ও কলুষিত ছিল। এরূপ ব্যক্তি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠা রূপবতীকে দীর্ঘকাল আয়ত্তে রাখিয়া তাঁহার পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছিল, ইহা কিরূপে বিশ্বাস হইবে ?

রামচন্দ্র। "সত্য! কিন্তু সীতাদেবী যে অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা আপনার চরিত্রের বিশুদ্ধি প্রমাণিত করিয়াছিলেন, প্রজাগণ কি তাহা অবগত নহে ?"

দূত। "অধিকাংশ প্রজাই অবগত নহে। যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি অবগত আছে, তাহাদিগেরও মধ্যে কেহ কেহ বলে, অগ্নি-পরীক্ষা কেবল চাটুবাদ মাত্র। অগ্নি আপনার দাহিকা শক্তি সংবরণ করিবেন, ইহা কি কখনও বিশ্বাসযোগ্য ? বিশেষতঃ তাহারা যদি মহারাজের অথবা কুমার লক্ষ্মণের মুখে অগ্নিপরীক্ষার কথা শুনিত, তাহা হইলে হয় ত বিশ্বাস করিতে পারিত। কিন্তু তাহারা কেবল লঙ্কাযুদ্ধের পর মহারাজের সঙ্গে যে সকল রাক্ষস ও বানর আসিয়াছিল, তাহাদিগেরই মুখে রাজমহিষীর অগ্নিপরীক্ষার কথা শুনিয়াছে। প্রজাগণ বলে যে, এই শ্রেণীর লোকদিগের বুদ্ধি ও বিচারশক্তি কতদূর যে, তাহাদিগের কথার উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারা যাইবে। অগ্নিপরীক্ষার কথা না বলিয়া মহারাজ যদি বলিতেন যে, "আমার স্ত্রী পরম রূপবতী, রূপজমোহে আমি তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না, তাহা হইলে বরং ভাল হইত।" লোককে অগ্নিপরীক্ষার কথা বলিয়া প্রবঞ্চিত করার অপেক্ষা এরূপ স্পষ্টবাদিতা ভাল। তবে তিনি রাজা, বলবান; সুতরাং যাহা ইচ্ছা বলিতে বা করিতে পারেন।"

দূত এই বলিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে বলিল, মহারাজ!

আমি প্রজাদিগের কথা যাহা শুনিয়াছি ও তাহাদিগের মনের ভাব যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই নিবেদন করিলাম। ইহা আমার নিজের মত নয়; আমি জানি যে, আমাদিগের রাজমহিষী লক্ষ্মীস্বরূপিনী; গঙ্গাজলে বরং মলিনতা আছে, কিন্তু তাঁহাতে মলিনতা নাই।"

রামচন্দ্র বলিলেন "দূত! তোমার অদ্যকার কার্য্য শেষ হইয়াছে, তুমি বিদায় লইতে পার।" দূত প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

দূতের সঙ্গে যতক্ষণ কথোপকথন করিতে ছিলেন, ততক্ষণ কর্ত্তব্যানুরোধে রামচন্দ্র কোনরূপ উদ্বেগের চিহ্ন প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু একক হইবার পরই তাঁহার বোধ হইল, যেন তাঁহার শরীরের প্রত্যেক অংশে তীক্ষ্ণবিষ বৃশ্চিক দংশন করিতেছে। তাঁহার সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল; হৃৎপিণ্ড প্রবলবেগে স্পন্দিত এবং মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তিনি মন্ত্রভবনে গমন করিয়া প্রতিহারী দ্বারা ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। আদেশ শ্রবণমাত্র তাঁহারা উপস্থিত হইলেন; কিন্তু রামচন্দ্রকে দেখিয়া তাঁহাদিগের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। যে সদানন্দময়, গম্ভীর পুরুষকে তাঁহারা কখনও বিষণ্ন ও ব্যাকুল হইতে দেখেন নাই, আজ দেখিলেন সামান্য জনের ন্যায় তিনি ভূমিতলে উপবিষ্ট রহিয়াছেন; তাঁহার মুখ মলিন, শরীর শীর্ণ এবং চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ। ভ্রাতৃগণকে দেখিয়া রামচন্দ্রের শোকসিন্ধু যেন উথলিয়া উঠিল; গণ্ডতল দিয়া নীরবে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভরত প্রভৃতি ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ পরে, কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া, রামচন্দ্র দূতের মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, সমস্তই বর্ণন করিলেন এবং করিয়া বলিলেন;

"ভ্রাতৃগণ! তোমরাই আমার বল, বুদ্ধি ও ভরসা; এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য পরামর্শ দাও।"

ভরত বলিলেন; "আর্য্য! আপনার ন্যায় ব্যক্তিকে আমরা কি পরামর্শ দিতে পারি? আমরা জানি, আপনি যাহা করিবেন, তাহাই ধর্ম্ম, আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই আপ্তবাক্য। তবে আমাদিগের এইমাত্র বক্তব্য যে, যে যাহা বলিবে তাহা শুনিতে হইলে সংসারে বাস করা চলে না। প্রজারা নির্ব্বোধ, তাহাদিগের কথা উপেক্ষা করাই সঙ্গত।"

লক্ষ্মণ বলিলেন; "দাদা! রাবণের শেলে বুক এখনও বিদীর্ণ হইয়া আছে, তাহার উপর বধূঠাকুরাণীর সম্বন্ধে কোন কঠোর আদেশ দিয়া আরও বিদীর্ণ করিবেন না। লক্ষ্মণকে যাহা বলিবেন লক্ষ্মণ তাহাই করিবে; কিন্তু লক্ষ্মণ লৌহ নয়, প্রস্তর নয়, রক্ত-মাংসের মানুষ, ইহা মনে রাখিবেন।"

শত্রুঘ্ন বলিলেন; "দাদা! আপনি আদেশ করুন, যাহারা বধূঠাকুরাণীর নিন্দা করিয়াছে, আমি তাহাদিগের জিহ্বা কাটিয়া আনিয়া দিতেছি।"

রামচন্দ্র বলিলেন; "ভ্রাতৃগণ! ভীত, মুগ্ধ, বা উত্তেজিত হইলে রাজধর্ম্ম প্রতিপালন হয় না। রাজধর্ম্ম সামঞ্জস্যের ধর্ম্ম। বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রীপুরুষ, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ সকলের কথা স্মরণ রাখিয়া, ইহকালের ও পরকালের সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া, কার্য্য না করিলে রাজাকে বিপন্ন ও পাপভাগী হইতে হয়। বিধাতা আমাদিগকে রাজকুলে প্রেরণ করিয়াছেন; আমরা যে যশস্বী মহাপুরুষদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাঁহাদিগের যশ ও গৌরব আমাদিগের কার্য্যের উপর নির্ভর করিতেছে। যশোধনদিগের নিকট যশ প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়। সুতরাং সকল দিক দেখিয়া এ সম্বন্ধে আমি যাহা স্থির করিয়াছি, তোমাদিগকে তাহা বলিতেছি। শুনিয়া যদি তোমাদিগের কোন বক্তব্য থাকে, অকুণ্ঠিত চিত্তে আমাকে বল।"

তিন ভ্রাতাই একসঙ্গে বলিলেন "আজ্ঞা করুন।"

রামচন্দ্র বলিলেন; "প্রজাগণ সীতার পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দেহ করে। রাবণের ন্যায় দুর্ব্বৃত্তের গৃহে বাসের পর এরূপ সন্দেহ করিলে তাহাদিগকে দোষী বলা যায় না। তাহারা বলে যে, আমি, রূপজমোহে মুগ্ধ হইয়া, অপবিত্রা নারীকে পত্নীর আসনে স্থান দিয়াছি। আমার দৃষ্টান্তে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পাইবে। একদিকে তাহাদের এই আশঙ্কা দূরকরা আমার কর্ত্তব্য; কিন্তু অপর দিকে যখন আমার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, সীতার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, তখন নিরপরাধে তাঁহার মর্য্যাদাভঙ্গ করাও আমার কর্ত্তব্য নয়। আমি যখন রাজা, প্রজাদিগের ধর্ম্মের রক্ষক, তখন, সুনীতি ও সদাচার রক্ষার জন্য, আমার নিজের যে কোন সুখ, যে কোন স্বার্থ বিসর্জ্জন করা আমার কর্ত্তব্য। আমি যে ইন্দ্রিয়জমোহে মুগ্ধ নই এবং প্রজাদিগের কল্যাণের জন্য আমি যে আমার হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত করিয়া ফেলিতে প্রস্তুত সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি তাহা দেখাইব। সেই সঙ্গে সীতা যে চিরপবিত্রা, সীতা যে সত্যই আমার প্রাণাধিকা, (বলিতে বলিতে রামচন্দ্রের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, তিনি অশ্রুমার্জ্জন করিয়া বলিলেন) সীতার প্রতি আমার আজীবনব্যাপী সমাদর, অনুরাগ ও একনিষ্ঠতার দ্বারা আমি তাহাও দেখাইব। ইহা হইলে উভয় কর্ত্তব্যেরই সামঞ্জস্য হইবে।"

ভরত বলিলেন। "উত্তম! কিন্তু বধূদেবীকে পরিত্যাগ করা ভিন্ন কি আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অন্য উপায় নাই?"

রামচন্দ্র। "না! আর কিছু উপায় থাকে ভাবিয়া বল। মনে কর, যদি আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ না করিয়া এই প্রাসাদেই রাখি, আর আমরা উভয়ে ব্রহ্মচর্য্যে জীবন যাপন করি, আমাদিগের সংযম

কি কেহ বিশ্বাস করিবে? প্রজাগণ তখনও বলিবে আমি কলঙ্কিনীর মোহে এরূপ মুগ্ধ যে, তাহার দর্শন, বাক্যশ্রবণ ও সংস্পর্শরূপ সুখ হইতে নিজেকে সংযত রাখিতে সমর্থ নই। আর সেরূপ অবস্থায় বাস সীতারও পক্ষে সুখশান্তির কারণ হইবে না। তাহার অপেক্ষা তপোবনে নির্ব্বিঘ্নে তপশ্চরণ করিতে পারিলে তিনি বরং সুখে ও শান্তিতে থাকিতে পারিবেন। সীতা হইতে পৃথক থাকিলে আমার যে কষ্ট হইবে, আমা হইতে পৃথক থাকিলে সীতার তদপেক্ষা অধিক কষ্ট হইবে না। কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমরা উভয়েই কষ্ট সহ্য করিব। আমরা পরস্পরের হৃদয় জানি। সীতা রাজপ্রাসাদেই থাকুন আর অরণ্যেই থাকুন, তিনি আমার হৃদয়ের মধ্যে আছেন, এ বিশ্বাস তাঁহার কখনই যাইবে না। এই বিশ্বাসেই দম্পতীর প্রকৃত সুখ; যখন এ সুখ হইতে কেহ আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না, তখন বিরহে ক্লেশ কি?"

রামচন্দ্র রাজোচিত ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের সহিত এই কথাগুলি বলিলেও তাঁহার ভ্রাতৃগণ বুঝিলেন যে, তাঁহার কথার বর্ণে বর্ণে তাঁহার হৃদয়স্থ অগ্নির জ্বালা নিঃসৃত হইতেছে। লক্ষ্মণ বলিলেন;

"আপনি বধূদেবীকে কোথায় পাঠাইবেন স্থির করিয়াছেন?"

রামচন্দ্র। "আমি তাঁহাকে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে পাঠাইব স্থির করিয়াছি। মহর্ষি রঘুকুল ও জনককুল উভয়েরই হিতৈষী এবং স্বর্গীয় পিতৃদেব ও রাজর্ষি উভয়েরই সুহৃদ্। আমার ও সীতার জীবনের সমস্ত ঘটনা তাঁহার সুপরিচিত। তিনি সীতাকে যেরূপ সদ্ভাবে গ্রহণ করিবেন, আর কেহ সেরূপ করিবেন না। তাহার উপর তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক এবং রাজনীতিজ্ঞ; বেদ, বেদাঙ্গ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ, সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁহার অধিকার আছে। সীতা পূর্ণগর্ভা, তাঁহার পুত্র হইলে মহর্ষির নিকট সেই বালক রাজ-

পুত্রোচিত শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। এই সকল কারণে সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে পাঠানই আমি সঙ্গত মনে করিতেছি। ভাই লক্ষ্মণ! আমি তোমাকে লৌহ বা প্রস্তর বলিয়া মনে করি না। রক্তমাংসে গঠিত মানুষ, আমার অপেক্ষা হৃদয়বান্ মানুষ, বলিয়াই মনে করি। সীতা অদ্য তপোবন দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমিও তাঁহাকে আগামী কল্য তপোবনদর্শনে পাঠাইব বলিয়া প্রতিশ্রুত আছি। ঘটনাক্রমে এই নিদারুণ বিধিবিড়ম্বনা উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহাকে তপোবনে রাখিয়া আসিবার ভার তোমাকেই লইতে হইবে। তুমি আমার ও সীতার উভয়েরই হৃদয় জান। তপোবনে যাইয়া, যে ভাবে ও যেরূপে, তাঁহাকে আমার অভিপ্রায় জানান কর্ত্তব্য মনে কর, জানাইও। প্রজাগণ যখন আমাকে রূপজ মোহে মুগ্ধ বলিয়া বিবেচনা করে এবং তাহা-দিগের সেই ভ্রম দূর করিতে যখন আমি কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, তখন, বিদায়ের পূর্ব্বে, সীতার সহিত আর আমার সাক্ষাতের প্রয়োজন নাই। আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে অন্তরে তাঁহাকে চিরদিন পূজা করিয়াই আমি তৃপ্তিলাভ করিব। তোমাকে আমার অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, ঐ সম্বন্ধে এই আমার শেষ কথা।"

ভ্রাতৃগণ শুনিয়া নীরব রহিলেন ; মন্ত্রসভা ভঙ্গ হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

নির্ব্বাসনের পর ক্রমে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল। কিন্তু নির্ব্বাসন কাহার? সীতাদেবীর না রামচন্দ্রের? সীতাদেবী অযোধ্যা হইতে নির্ব্বাসিতা হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু রামচন্দ্রও কি সেই

অযোধ্যায় ছিলেন ? তাহা হইলে তাহার একজনও ব্যক্তি, একটীও দৃশ্য, একটীও তরুলতা তাঁহাকে আর পূর্ব্বের মত প্রীত করে না কেন ? বাহিরের নির্ব্বাসনত নির্ব্বাসন নয় ; অন্তরের নির্ব্বাসনই প্রকৃত নির্ব্বাসন। এই জন্যই প্রিয়জনের সহবাসে মরুভূমি গৃহ হয় এবং তদভাবে গৃহ মরুভূমির আকার ধারণ করে। রামচন্দ্রের নিকট অযোধ্যা এখন নির্ব্বাসন-ভূমি মহামরুতে পরিণত হইয়াছে। অন্তরে, বাহিরে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সীতাদেবীর সহিত এক সঙ্গে আহুতি-দান করিবেন বলিয়া যে অরুণোদয়ের জন্য রামচন্দ্র প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন, সে অরুণোদয় এক্ষণে তাঁহার নেত্রজ্বালা উৎপাদন করে। প্রাসাদ-বাতায়ন হইতে জ্যোৎস্নাসমুজ্জ্বল সরযূর জলক্রীড়া দেখিবার জন্য রামচন্দ্র যে পূর্ণিমারজনীর প্রতীক্ষা করিতেন, সেই পূর্ণিমারজনী এখন তাঁহার নেত্র অশ্রুসিক্ত করিয়া দেয়। যে মন্দিরে উভয়ে একসঙ্গে প্রতিদিন প্রণাম করিতে যাইতেন, সে মন্দির এখন তাঁহার নিকট দেবতাশূন্য বলিয়া বোধ হয়। যে সুমন্দ অনিল, যে প্রস্ফুটিত কুসুম, যে বিহগের মধুর সঙ্গীত তাঁহার হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ করিত, এখন তাহা বিষবৃষ্টি করে। লঙ্কা হইতে প্রত্যাগমনের পর সীতাদেবীর সঙ্গে বাস করিবার জন্য তিনি যে সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার মধ্যে তিনি প্রবেশ করিতে পারেন না। বহুযত্নে নির্ম্মিত সরযূতীরবর্ত্তী রমণীয় উপবন এক্ষণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। কেবল জড়প্রকৃতি সম্বন্ধে এই বিরাগ নয়, অযোধ্যাবাসী ও অযোধ্যাবাসিনীদিগকেও আর তিনি সেই পূর্ব্বের স্নেহদৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না। তাহা-দিগের মঙ্গলের জন্য যাহা করা কর্ত্তব্য, তিনি সর্ব্বদাই তাহা করিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক স্নেহপ্রবণতা অজ্ঞাতসারে ক্ষীণ হইয়াছে। তাঁহার আহার হইতে তৃপ্তি, নয়ন হইতে নিদ্রা এবং

হৃদয় হইতে শান্তি নির্ব্বাসিত হইয়াছে। সেই জন্যই বলিতে-ছিলাম নির্ব্বাসন কাহার? রামচন্দ্রের, সীতাদেবীর, না উভয়ের?

বাহিরের লোক রামচন্দ্রের ব্যবহারে কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইত না। রাজসভায় তিনি আচাররক্ষক, শাস্ত্রদর্শী, দৃঢ় পরিশ্রমী রাজা; মন্ত্রণাকক্ষে তিনি কুশাগ্রবুদ্ধি, দূরদর্শী, রাজনীতিজ্ঞ; বিচারগৃহে তিনি ন্যায়নিষ্ঠ, অপক্ষপাতী বিচারক; সুতরাং প্রজারা ভাবিত তিনি সীতাশোক অনায়াসেই সহ্য করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে ঘনিষ্ঠরূপে দেখিতেন, তাঁহারা সকলে, বিশেষতঃ কৌশল্যা ও লক্ষ্মণ, বুঝিতেন কি দাবানলে দিবারাত্র তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইতেছে। সীতাদেবীর নির্ব্বাসনকালে কৌশল্যা ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন; যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন সকল শেষ হইয়া গিয়াছিল, তিনি আর কি করিবেন? তিনি জানিতেন, তাঁহার যে দেবতুল্য পতি নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তথাপি সত্য-চ্যুত হন নাই, রামচন্দ্র তাঁহারই ঔরসজাত; সুতরাং রামচন্দ্র যে নিজের হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত করিয়া কর্ত্তব্যপালন করিবেন, ইহাতে তিনি বিস্মিতা হন নাই। কিন্তু তিনি মাতৃ-দৃষ্টিতে দেখিতেন তাঁহার পুত্রের বীরবপু দিন দিন শুষ্ক হইয়া আসিতেছে; তাঁহার নয়নদ্বয় কোটরগত এবং ললাট গভীর রেখাঙ্কিত হইতেছে। আহারে, বিশ্রামে, এমন কি পূজা আরাধনায়, তাঁহার চিত্ত শান্তিহীন। দেখিয়া কৌশল্যার হৃদয় বিদীর্ণ হইত, কিন্তু তিনি বুঝিতেন প্রতিবিধানের উপায় নাই, তিনি নীরবে সহ্য করিতেন। আর লক্ষ্মণ? লক্ষ্মণ বুঝিতেন সীতাহীন রামচন্দ্র বিকলাঙ্গ ও জীবনীশক্তিহীন। এ অবস্থায় তাঁহাকে যে ভাবে সেবা করিলে তাঁহার প্রাণরক্ষা হইতে পারে, সেই ভাবে তিনি তাঁহার সেবা করিতেন। স্বয়ং কৌশল্যা যাহা পারিতেন না, লক্ষ্মণ তাহা করিতেন। যে দিন রাজসভায়

কোনও সুশীলা পত্নীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের জন্য কোনও দুর্ব্বৃত্ত পতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আসিত, লক্ষ্মণ জানিতেন যে, সে দিন রামচন্দ্রের রাত্রিতে নিদ্রা হইবে না. যেদিন কোনও উত্তরাধিকারিহীন ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত হইবার আদেশ হইত, লক্ষ্মণ জানিতেন সে দিন রামচন্দ্রের বিশ্রাম-সুখ ঘটিবে না ; তিনি বুঝিয়া পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকিতেন। সীতাদেবীকে নির্ব্বাসিতা করিয়া, এবং স্বয়ং সুখ, শান্তি হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া, রামচন্দ্র এইরূপে জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন।

প্রথমে সীতা-নির্ব্বাসন লইয়া প্রজাদিগের মধ্যে যে আন্দোলন ও আলোচনা আরব্ধ হইয়াছিল, তাহা ক্রমে মন্দীভূত হইয়াছিল। দ্বাদশবর্ষান্তে হঠাৎ একটী বিশেষ কারণে আবার তাহা উজ্জীবিত হইয়াছে। রামচন্দ্র অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের আয়োজন করিয়াছেন। এই যজ্ঞে সস্ত্রীক ব্রতাচরণ ও হোমাগ্নিতে আহুতি-দান করিতে হয়। এজন্য বৃদ্ধা মহিষীগণ, কুলগুরু বশিষ্ঠদেব এবং প্রধান প্রধান প্রজাবর্গ সকলেই রামচন্দ্রকে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহাতে সম্মত হন নাই। তিনি স্বর্ণময়ী সীতাপ্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া এবং প্রাণপ্রতিষ্ঠান্তে তাঁহাকে সহধর্ম্মিণীস্থানীয়া করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। দেশ দেশান্তরের লোক আহূত হইয়া যজ্ঞদর্শনার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রের ব্যবহার তাঁহাদিগের ও পুরবাসিগণের আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। সাধুসজ্জনগণ, তাঁহার অমানুষিক সংযমে ও সহধর্ম্মিণীর প্রতি একনিষ্ঠতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছিলেন। কিন্তু দুর্জ্জনের জিহ্বা কুৎসারটনাতেও নিরস্ত ছিল না। তাহারা বলিতেছিল, "রাজচরিত্র দুর্জ্জেয় ; যে রমণীকে কলঙ্কিনী ভাবিয়া একবার নির্ব্বাসন দিয়াছেন,

জিনিকোটী সুধাকর কিবা মুখ মনোহর,
অঙ্গে শোভে নানা আভরণ।
বসায়ে বেদীর পরে, দোঁহার মিলায়ে করে,
রাজঋষি ক'ন স্নেহভরে;
"শুন, রাম গুণধাম! সুতা মম সীতা নাম
অর্পিলাম আজ তব করে।
সতী মাঝে নিরুপমা, লাবণ্যে কমলা সমা,
সীতার তুলনা নাই ভবে;
তব সুখে পাবে সুখ, দুখে তব পাবে দুখ,
ছায়া সম সাথে সাথে র'বে।"
সীতা, রাম পুলকিত, স্পর্শে তনু রোমাঞ্চিত,
মিলে চারি নয়নে নয়ন;
মুখে মৃদু হাসি ফুটে, আঁখিতে পুলক ছুটে;
উলুধ্বনি দেয় রামাগণ।
মোহিত মিথিলাবাসী, করযোড়ে সবে আসি,
প্রণময়ে দোঁহার চরণে।
গাও, বীণা! তুলিতান সীতারাম-গুণগান
কি আনন্দ দোঁহার মিলনে।"

বালকদিগের কিন্নর-নিন্দিত কণ্ঠের স্বরে বনভূমি প্লাবিত হইতে লাগিল। শুনিয়া ঋষিপত্নীগণ বলিলেন "আবার গাও।" বালকেরা আবার তেমনি মধুরস্বরে সেই গান করিল। শুনিয়া তৃপ্তিবোধ হইল না, তাঁহারা বলিলেন "আবার গাও" বালকেরা আবার গাইল। এইরূপ চার, পাঁচ বার গান করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া

আসিল। তখন ঋষিপত্নীদিগের মধ্যে কেহ তাহাদিগের মুখচুম্বন করিয়া, কেহ তাহাদিগের হস্তে কোন সুমিষ্ট দ্রব্য দিয়া, কেহ আশীর্ব্বাদ করিয়া, তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। বালকেরা, তাঁহাদিগের চরণে প্রণাম করিয়া সমীপবর্ত্তী একটী কুটীরে প্রবেশ করিল।

এক শান্তোজ্জ্বল-মূর্ত্তি তপস্বিনী এই কুটীরের দ্বারে বসিয়া রামায়ণ-গান শ্রবণ করিতে ছিলেন। তাঁহার শরীর শীর্ণ, মুখ শুষ্ক; তথাপি লাবণ্যময়ী ছায়া তাঁহাকে দেবীর ন্যায় জ্যোতিতে বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি বাম করে কপোল বিন্যস্ত করিয়া ছিলেন, আর তাঁহার নীলোৎপল তুল্য চক্ষু দুইটী হইতে অবিরল অশ্রু তাঁহার করতল বহিয়া ভূতলে পতিত হইতে ছিল। বালকদিগকে কুটীরের দিকে আসিতে দেখিয়া তিনি অশ্রুমার্জ্জন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বালকেরা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তাহাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠটী বলিল, "মা! আজ তুমি রামায়ণগান শুনিতে যাও নাই কেন?"

তপস্বিনী বলিলেন; "বাবা! আমি এখানে বসিয়া শুনিতে ছিলাম, এখান হইতেও বেশ স্পষ্ট শোনা যায়।"

কনিষ্ঠটী মাতার চক্ষু অশ্রুসিক্ত দেখিয়া বলিল, "মা! তুমি রামায়ণগান শুনিলে এত কাঁদ কেন? তুমি যদি কাঁদ, তবে আমরা আর রামায়ণ গান করিব না।"

তপস্বিনী বলিলেন, "না বাবা! এমন কথা বলিও না; তোমাদের এই রামায়ণগান শুনিয়াই আমি বাঁচিয়া আছি। গান শুনিয়া আমি কান্না রাখিতে পারি না বটে, কিন্তু সে কান্নাতে আমার সুখ আছে। তোমরা রামায়ণগান না করিলে আমি মরিয়া যাইব।"

জ্যেষ্ঠ বালক। "মা! এতদিন পরে আজ আমাদের মনের একটী মহাসংশয় দূর হইয়াছে।"

তপস্বিনী। "কি সংশয়, বাবা!"

জ্যেষ্ঠ বালক। "আমরা যেদিন গুরুদেবের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, রামচন্দ্র লোকনিন্দা শ্রবণে সীতাদেবীকে ত্যাগ করিয়াছেন, সে দিন আমাদের ভয়ানক ক্রোধ হইয়াছিল। আমরা ভাবিয়াছিলাম এমন লোকের চরিত আর আমরা পাঠ করিব না। আমরা গুরুদেবকে বলিলাম, "প্রভো! রামচন্দ্র সীতাদেবীকে নির্ব্বাসিতা না করিয়া তাঁহাকে লইয়া নিজে বনে গেলেন না কেন? সীতার একটী পদরেণুর সঙ্গেত শত অযোধ্যার তুলনা হয় না। কতক গুলি নির্ব্বোধ, নিন্দক ব্যক্তির কথায় তিনি সীতার ন্যায় পত্নীকে ত্যাগ করিলেন! প্রজারঞ্জন বড় না নির্দ্দোষীকে বৃথা অপবাদ হইতে রক্ষা করা বড়?"

তপস্বিনী। "মহর্ষি শুনিয়া কি বলিলেন?"

জ্যেষ্ঠ বালক। "মহর্ষি বলিলেন; "বৎসগণ! তোমাদের বিচার সুসঙ্গত হয় নাই। রামচন্দ্র রাজা; প্রজাদিগকে পালনই রাজধর্ম্ম, পরিত্যাগ রাজধর্ম্ম নয়। রাবণের ন্যায় দুর্ব্বৃত্তের গৃহে দীর্ঘকাল বাস করিয়া কোনও নারী সতীধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন প্রজারা ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিবে? রামচন্দ্র সীতার হৃদয়, সীতার মানসিক বল জানিতেন; কিন্তু প্রজাদিগের তাহা জানিবার সুযোগ কোথায়? প্রজাগণ অগ্নিপরীক্ষা দর্শন করে নাই, সুতরাং তাহারা যদি সীতার পবিত্রতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করে, তবে সেই অপরাধে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া একটী অরাজকতা উৎপাদন করা কি প্রজাহিতৈষী রাজার কর্ত্তব্য। মনে কর, রামচন্দ্র যদি রাজ্য ত্যাগ করিতেন, তবে ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন কেহ কি সে রাজ্য গ্রহণ করিতেন? রামচন্দ্রের তখন পুত্র হয় নাই, কে রাজ্যের অধিকারী হইতেন? জ্ঞাতি-বিবাদে, না হয়

প্রতিবাসী কোন বলবান রাজার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, প্রাচীন ইক্ষাকু-কুল ধ্বংস হইত; সরযূ রক্তস্রোত বহন করিত; ইহা কি সঙ্গত হইত? রামচন্দ্র যদি সীতার জন্য রাজ্য ত্যাগ করিতেন তবে স্বার্থপর ও কর্ত্তব্যভীরু বলিয়া তিনি সাধুসমাজে নিন্দনীয় হইতেন!"

"মা! আমরা বুঝিয়া দেখিলাম, মহর্ষির কথা অসঙ্গত নয়। কিন্তু একটী বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ ছিল। আমরা ভাবিতাম রামচন্দ্রত প্রজাদিগের প্রতি কর্ত্তব্যপালনের জন্য সীতাদেবীকে ত্যাগ করিলেন, কিন্তু যখন তিনি সীতাদেবীকে নিরপরাধা বলিয়া জানিতেন, তখন তাঁহার প্রতি নিজের কি কর্ত্তব্য করিলেন! সীতাদেবীর অলীক অপবাদ খণ্ডন করাও ত তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য; তাহা না করিলে তাঁহার মহত্ব কিরূপে স্বীকার করিব? এতদিন পরে আমাদিগের সেই সংশয় দুরীভূত হইয়াছে।"

তপস্বিনী। "কিরূপে হইল।"

জ্যেষ্ঠ বালক। "মা! আজ অযোধ্যা হইতে নিমন্ত্রণের পত্র লইয়া এক দূত আসিয়াছিল। শুনিলাম রাজা রামচন্দ্র, অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া, গুরুদেবকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমরা দূতের নিকট যজ্ঞের নানাবিধ সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। যাহা শুনিলাম, তাহাতে বিস্মিত হইলাম। যে বিপুল আয়োজন হইয়াছে, তাহা অতি অদ্ভুত; কিন্তু তাহার অপেক্ষা আরও অদ্ভুত একটী কথা শুনিলাম। মা! তুমি বোধ হয় জান যে, অশ্বমেধ যজ্ঞে সস্ত্রীক আহুতিদান করিতে হয়।"

তপস্বিনী ব্যগ্রভাবে বলিলেন; "তবে কি রামচন্দ্র পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিয়াছেন?"

জ্যেষ্ঠ বালক। "না মা! তাহা হইলেত আমাদিগের সংশয়

আরও দৃঢ়ীভূত হইত। দারপরিগ্রহের জন্য পুরবাসিগণ, বৃদ্ধা মহিষীগণ, এমন কি স্বয়ং বশিষ্ঠদেব পর্য্যন্ত রামচন্দ্রকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কাহারও অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। তিনি, সীতাদেবীর এক স্বর্ণময়ী প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া, এবং প্রাণপ্রতিষ্ঠান্তে তাঁহাকেই পত্নীস্থানীয়া করিয়া, যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মা! যে রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনের অনুরোধে প্রাণাধিকা সীতাকে নির্ব্বাসনে পাঠাইয়াছেন, সেই রামচন্দ্রই ভারতের নিমন্ত্রিত রাজগণের ও ঋষিগণের সমক্ষে সেই নির্ব্বাসিতা সীতাকে ধর্ম্মপত্নীর আসন দিয়া তাঁহার অপবাদ খণ্ডন করিলেন, ইহার অপেক্ষা রাজধর্ম্মের ও দাম্পত্যধর্ম্মের উৎকৃষ্ট সামঞ্জস্য আর কি হইতে পারে? সেইজন্যই বলিতে ছিলাম, আমাদিগের সংশয় এতদিনে দূর হইয়াছে। আমরা গুরুদেবের মুখে অনেক মহাপুরুষের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু এমন পাষাণকঠোর এবং এমন কুসুমকোমল মহাপুরুষের কথা কখনও শুনি নাই।"

বালকের কথা শুনিবার সময় তপস্বিনীর দুইটী চক্ষু দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে ছিল। দেখিয়া কনিষ্ঠ বালকটী বলিল; "মা! তুমি আবার কাঁদিতেছ? রামচন্দ্রের কথা শুনিলে তুমি এত কাঁদ কেন?"

তপস্বিনী। "বাবা! আমি দুঃখে কাঁদি নাই, রামচন্দ্রের গুণের কথা শুনিয়া, আনন্দে কাঁদিতেছি। রামচন্দ্র একবার সীতাকে বলিয়াছিলেন; "সুখে দুঃখে, মিলনে বিরহে, কোমলতায় কঠোরতায় কখনও রামের হৃদয়কে অবিশ্বাস করিত না।" সে কথা সার্থক হইল।"

কনিষ্ঠ বালক। "মা! আমরা যখন রামচন্দ্রের কথা বলি, তখন তুমিও অনেক কথা বল। রামায়ণে যে সকল কথা নাই

তুমি তাও বল। তুমি এ সকল কেমন করিয়া জানিলে?” রামচন্দ্রকে কি তুমি জানো?”

তপস্বিনী। “তিনি দেবতা, আমরা মানুষ; তাঁহার সকল গুণ কিরূপে জানিব? তবে যাঁহারা সাধুলোক তাঁহাদের কথা সকলেই জানে; রামচন্দ্র সাধু, তাই অনেকের নিকট তাঁহার কথা শুনিয়াছি। আর রামচন্দ্র আমাদের রাজা, আমরা তাঁর প্রজা; প্রজা মাত্রেই রাজার কথা কিছু না কিছু জানে।”

জ্যেষ্ঠ বালক। “মা! তোমার নিকট আমাদের একটী প্রার্থনা আছে। শুনিয়াছি গুরুদেব নিমন্ত্রণরক্ষার্থ কাল অযোধ্যায় যাইবেন। তাঁহার সঙ্গে বিদ্যার্থীদিগের মধ্যে অনেকেই যজ্ঞ দেখিতে যাইবেন। রামচন্দ্রকে দেখিব বলিয়া অনেক দিন হইতে আমাদের সাধ আছে। তুমি অনুমতি দিলে আমরা গুরুদেবের সঙ্গে যাইতে পারি।”

তপস্বিনী। “মহর্ষি সঙ্গে লইয়া যাইতে সম্মত হইলে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু যাওয়া হইলে সেখানে যেন কোন অশিষ্ট ব্যবহার করিও না।”

জ্যেষ্ঠ বালক। “মা! তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও। গুরুদেব ফিরিয়া আসিলে তুমি জিজ্ঞাসা করিও, আমরা কেমন ব্যবহার করি।”

কথোপকথনে ক্রমে রাত্রি হইয়াছিল; দেখিয়া তপস্বিনী বলিলেন, “বাবা! সমস্ত দিন ক্রীড়ায় ও অনেকক্ষণ গান করিয়া তোমরা শ্রান্ত হইয়াছ, এখন বিশ্রাম কর।”

এই বলিয়া তিনি গৃহতলে একখানি মৃগচর্ম্ম প্রসারিত করিলেন। এবং দুইজনকে দুইদিকে রাখিয়া নিজে মধ্যস্থলে শয়ন করিলেন।

বলিতে হইবে কি যে, এই তপস্বিনীই আমাদিগের সীতাদেবী এবং এই দুইটী বালক তাঁহার পুত্রদ্বয় কুশ এবং লব। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের আদেশে সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইলে মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহাকে নিজের আশ্রমে রাখিয়া দুহিতার ন্যায় স্নেহে পালন করিয়াছিলেন। আশ্রমস্থ অতি অল্প ব্যক্তিই সীতাদেবীর প্রকৃত পরিচয় জানিতেন। সাধারণের নিকট অজ্ঞাত থাকিয়া তিনি তপশ্চর্য্যায় দিনপাত করিতেন। আশ্রমে আগমনের সময় তিনি পূর্ণগর্ভা ছিলেন, সেখানে যমজ সন্তান প্রসব করিলেন। মহর্ষি তাহাদিগের জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন করিয়া জ্যেষ্ঠের নাম কুশ ও কনিষ্ঠের নাম লব রাখিয়াছিলেন। কুশ, লবের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে মহর্ষি তাহাদিগকে রাজপুত্রোচিত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন। বালকেরা রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, বেদ, বেদাঙ্গ সর্ব্ব বিদ্যায় পারদর্শী হইল। বাণক্ষেপে প্রসিদ্ধনামা ধনুর্দ্ধরদিগকেও তাহারা পরাস্ত করিত। তাহারা মহর্ষির রচিত রামায়ণ পাঠ করিয়া তান লয় সংযোগে তপোবনবাসীদিগকে তাহা গান করিয়া শুনাইত; কিন্তু রামচন্দ্র ও সীতাদেবী যে কে তাহা জানিত না। পাঠক! আমরা সেই গানই শ্রবণ করিয়াছি।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অরুণোদয়ের সঙ্গে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে মহা কোলাহল উত্থিত হইয়াছে। আশ্রমস্থ ঋষিগণ ও বিদ্যার্থিগণ অযোধ্যাগমনের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কেহ মৃগচর্ম্ম, কুশাসন ও কমণ্ডলু, কেহ যজ্ঞীয় সোমকণ্ডনের পাত্র, চমস ও স্রুক্ এবং কেহ বা অগ্নি প্রজ্বালকের সহায় খনিত্র, লৌহশলাকা ও কুঠার বন্ধন করিয়া পৃষ্ঠে

আরোপণ করিতেছেন। বিদ্যার্থিগণ পুস্তক সঙ্গে লইয়া যাইতে অনিচ্ছুক, কিন্তু তাঁহাদিগের উপাধ্যায়গণ বলিতেছেন, "দীর্ঘকাল পাঠবিমুখ হইয়া থাকা কর্ত্তব্য নয়, অন্ততঃ নিরুক্ত ও ব্যাকরণ সঙ্গে লইয়া চল, অবসরক্রমে পাঠ করিবে।" এ কথা ছাত্রদিগের বড় প্রীতিকর হইতেছে না। তাঁহারা বলিতেছেন, "রাজগৃহের নিমন্ত্রণে নৃত্যগীত ও কৌতুক দর্শনের জন্যইত গমন, সেখানে যদি ব্যাকরণের সূত্র আবৃত্তি করিতে হয়, তবে গমনের প্রয়োজন কি?" উভয় পক্ষে এইরূপ বাদানুবাদ চলিতেছে। কোন ক্ষুধাকাতর ছাত্র, গোপনে, কয়েকটী সুপক্ক কদলী ও একটী বিল্বফল কমণ্ডলুর মধ্যে লইয়াছিলেন; হঠাৎ কাহারও দৃষ্টিপথে তাহা পতিত হওয়াতে তুমুল সমালোচনা আরব্ধ হইয়াছে। অপরাধী ছাত্রের নাম লইয়া কেহ বলিতেছেন, "ভো ভো ভাণ্ডায়ন! দেখিয়াছ হে! হারীত কিরূপ ঔদরিক, কমণ্ডলুর মধ্যে কদলী ও বিল্বফল লইয়া চলিয়াছে!"

ভাণ্ডায়ন বলিলেন, "হা ধিক্! হা ধিক্! এত বয়স হইল, কিন্তু হারীতের জিহ্বালাম্পট্য দূর হইল না।" শুনিয়া অপর একজন বলিলেন, "এইবার হইতে উহাকে হারীত না বলিয়া "কুম্ভোদর" বলিয়া ডাকা যাইবে।" শুনিবামাত্র সকলেই করতালি দিয়া হারীতকে "কুম্ভোদর" "কুম্ভোদর" বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। হারীত লজ্জায় অধোবদন হইলেন।

অকস্মাৎ সংবাদ আসিল যে, মহর্ষি বাল্মীকি সেই দিকে আগমন করিতেছেন; মুহূর্ত্তমাত্রে কোলাহল নিস্তব্ধ হইল। মহর্ষি স্নানাহ্নিক সমাপনান্তে সীতাদেবীর কুটীরাভিমুখে চলিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বেই তাঁহার সহিত কুশ ও লবের অযোধ্যাগমনের সংবাদ সীতাদেবীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছিলেন। সীতাদেবী জানিতেন না যে, মহর্ষি, তাদৃশ

সময়ে, তাঁহার কুটীরে আসিবেন, সুতরাং তিনি অন্যান্য দিনের ন্যায় স্নানান্তে পূজায় বসিয়াছিলেন। মহর্ষি, তাঁহার কুটীরের দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া, নিঃশব্দে অগ্রসর হইলেন, এবং দ্বারদেশ হইতে দেখিলেন, সীতাদেবী একাগ্রচিত্তে পূজায় ব্যাপৃতা আছেন। তাঁহার সম্মুখে কোন ঘট, পট বা বিগ্রহ নাই ; কিন্তু একখানি শিলাফলক রহিয়াছে। তাহাতে দুইটী ধ্বজবজ্রাদি চিহ্নিত রাজপদ চন্দনদ্বারা অঙ্কিত আছে। সীতাদেবী তাহা পুষ্পদামে সজ্জিত করিয়া ভক্তি-গদগদ চিত্তে পূজা করিতেছেন। মহর্ষি দেখিলেন, ভক্ত অভীষ্ট-দেবতার দর্শন পাইলে তাঁহাকে যে ভাবে পূজা করেন, সীতাদেবী, সেই ভাবে, সেই পদচিহ্ন পূজা করিয়া, করযোড়ে প্রণামপূর্ব্বক, বলিলেন ; "পাদপদ্মে অধিষ্ঠিত দেবতা ! রঘুকুলের কল্যাণ হউক ; অযোধ্যার প্রজাবর্গের কল্যাণ হউক ; সীতা জন্ম জন্ম এই পাদপদ্ম পূজার অধিকারিণী হউক।"

এই পাদপদ্ম কাহার মহর্ষি দৃষ্টিমাত্র তাহা বুঝিলেন ; তাঁহার নয়ন অশ্রুপ্লুত হইল। এই সময় পূজান্তে মহর্ষির দিকে সীতাদেবীর দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি ব্যগ্র হইয়া মহর্ষিকে প্রণাম করিলেন এবং পাদপদ্মাঙ্কিত ফলক বস্ত্রাঞ্চলে গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন।

মহর্ষি বলিলেন ; "বৎসে ! সঙ্কোচের কারণ নাই ; পৃথিবীতে যাঁহারা এতদিন পতিব্রতাকুলের রাজ্ঞী বলিয়া সমাদৃতা হইতেছেন, তুমি তাঁহাদিগকেও পরাস্ত করিয়াছ। আশীর্ব্বাদ করি, যেন পৃথিবীতে পতিদেবতা নারীদিগের নামোল্লেখকালে লোকে অগ্রে তোমারই নাম করে। বৎসে ! আমি তোমার নিকট একটী প্রস্তাব করিতে আসিয়াছি। আমি অদ্য কুশ ও লবকে লইয়া যজ্ঞদর্শনার্থ গমন করিব। অবস্থা বিবেচনায় যদি তোমাকে সেখানে যাইবার জন্য সংবাদ পাঠাই, তবে গমনে কুণ্ঠিতা হইও না।"

সীতাদেবী বলিলেন; "পিতঃ! আপনার আদেশ শিরোধার্য্য; যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, সেইরূপই করিব। কিন্তু সীতার সংসারিণী হইবার আর আশা নাই। পদ্মিনী লক্ষ যোজন দূরস্থ সূর্য্যদেবকে আপনার পার্শ্বস্থ সলিলে প্রতিবিম্বিত দর্শন করিয়াই যেমন প্রফুল্ল থাকে, সীতাও দূর হইতে এই পাদপদ্মে অধিষ্টিত সেই দেবতার পূজা করিয়াই তেমনই তৃপ্ত থাকিবে।" মহর্ষি শুনিয়া কোন প্রত্যুত্তর দিলেন না; তিনি সীতাদেবীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় লইলেন।

পাঠক! পাঠিকা! কল্পনা সাহায্যে আমরা একসঙ্গে বহু স্থান দর্শন করিয়াছি। মিথিলার বিবাহ-সভা, অযোধ্যার রাজান্তঃপুর, দণ্ডকাস্থিত পঞ্চবটী, রাক্ষসপূর্ণ লঙ্কাপুরী, এবং মহর্ষি বাল্মীকির তপোবন দর্শন হইয়াছে; আসুন অন্য একটী স্থানে গমন করি। অই যে বহু যোজনবিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে ঘনসন্নিবিষ্ট শিবিরশ্রেণী লক্ষিত হইতেছে, যথায় সহস্র সহস্র রাজা, ঋষি, বণিক ও ভিক্ষুক সন্মিলিত হইয়াছেন; রণোন্মত্ত অশ্ব, গজ, ও সৈনিকদিগের চীৎকারের সঙ্গে যে স্থান হইতে ঋত্বিকগণের কণ্ঠ-নিঃসৃত বেদগান শ্রুত হইতেছে, উহার নাম নৈমিষারণ্য। রামচন্দ্র, তাঁহার অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপনের জন্য, অযোধ্যা হইতে এখানে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার আদেশে এই স্বভাবতঃ নির্জ্জন প্রদেশ জন-কোলাহলপূর্ণ মহানগরীতে পরিণত হইয়াছে। নিমন্ত্রিতদিগের বাসের জন্য তথায় বিচিত্র ভবন সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে, পানীয় জলের জন্য সরোবর খনিত হইয়াছে, সুরম্য উদ্যান ও প্রশস্ত রাজপথ রচিত হইয়াছে। শিল্পাগার, বিপনী, পাকভবন, সৈনিকা-বাস, দেবমন্দির কিছুরই সেখানে অভাব নাই। রাজকর্ম্মচারিগণ অশ্বপৃষ্টে ভ্রমণ করিয়া নিমন্ত্রিতদিগের পরিচর্য্যার আয়োজন

করিতেছেন। যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইতেছে; কাহারও মুখে অভাবের কথা নাই, অসন্তোষের ভঙ্গী নাই; সুশৃঙ্খলায় সমস্ত কার্য্য চলিয়াছে।

নৈমিষারণ্যে আগমনের পর, মহর্ষির আদেশে, কুশ ও লব কয়েক দিন অবধি রামায়ণ গান করিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে শুনাইতেছিলেন। একে রামচন্দ্রের চরিত, তাহার উপর মহর্ষির রচনা, সেই সঙ্গে কুশ, লবের কিন্নর-নিন্দিত কণ্ঠ, যে সেই সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছে, সেই মোহিত হইতেছে। লোকের প্রশংসা শুনিয়া রামচন্দ্রও একদিন সপরিজনে তাহা শ্রবণ করিলেন, এবং শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইলেন। ক্রমে মহর্ষির মুখে কুশ, লবের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া তাঁহার হৃদয়ে সীতাশোক উদ্বেল হইয়া উঠিল। কৌশল্যাদি মহিষীগণ এবং ভরত, লক্ষ্মণাদি ভ্রাতৃগণ শুনিয়া সীতাদেবীকে পুনর্ব্বার গ্রহণের জন্য তখন রামচন্দ্রকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বাল্মীকিও সীতাদেবীকে তপোবন হইতে আনয়ন সম্বন্ধে রামচন্দ্রের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। রামচন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন, "প্রভো! ইহার পরিণাম কি হইবে বলিতে পারি না; তবে যখন আপনাদিগের সকলের ইচ্ছা তখন আমার অসম্মতি নাই।"

শুনিয়া মহর্ষি সীতাদেবীকে আনয়নের জন্য তপোবনে লোক প্রেরণ করিলেন। সীতাদেবী, ঋষিপত্নীদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, স্পন্দিত হৃদয়ে নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলেন। স্থির হইল যে, যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দানের দিন, যখন রাজগণ, ঋষিগণ, ও পৌর-জানপদবর্গ সকলেই যজ্ঞসভায় উপস্থিত থাকিবেন, তখন মহর্ষি স্বয়ং সীতাদেবীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার পুনর্গ্রহণ সম্বন্ধে প্রস্তাব করিবেন; বশিষ্ঠদেব প্রভৃতি তাহা অনুমোদন করিবেন। মহর্ষি

ভাবিলেন, যদি বিধাতা প্রসন্ন হন, তবে, স্বর্ণময়ী সীতার পরিবর্ত্তে, শরীরিণী সীতাই স্বয়ং রামচন্দ্রের সঙ্গে পূর্ণাহুতি দান করিবেন।

অদ্য আহুতিদানের দিন; যজ্ঞসভা লোকে পূর্ণ। বিশাল চন্দ্রাতপের তলে রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণে ও অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া উপবেশন করিয়াছেন। এক দিকে রাজগণ ও ঋষিগণ, অপর দিকে পৌরজানপদবর্গ। কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষীগণ এবং ঊর্ম্মিলা প্রভৃতি সীতাদেবীর ভগ্নীগণ, স্বতন্ত্র স্থানে উপবেশন করিয়া, উৎসুক হৃদয়ে সীতাদেবীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

রামচন্দ্রের হৃদয় প্রবল বেগে স্পন্দিত হইতেছে; সকলেরই দৃষ্টি সভার দ্বারে। কিয়ৎক্ষণ পরে রক্ষিগণ সমীপবর্ত্তী ব্যক্তিদিগকে অপসৃত হইবার জন্য সঙ্কেত করিল। সীতাদেবী শিবিকা হইতে অবতীর্ণা হইলেন। তাঁহার সম্মুখে প্রশান্ত মূর্ত্তি, শ্বেতশ্মশ্রু, মহর্ষি বাল্মীকি, পার্শ্বে দেবকুমার সদৃশ সুকুমারতনু কুশ ও লব। সহস্র সহস্র নেত্র তখন সেই দিকে সম্বদ্ধ হইল। যাঁহারা সীতাদেবীকে, একদিন, নববধূবেশে অযোধ্যায় প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়া চমকিত হইলেন এবং ক্ষোভে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মস্তক অবনত করিলেন। সেই স্ফুটনোন্মুখী চম্পক-কলিকা সদৃশী সীতা, সেই সাক্ষাৎ কমলারূপিণী বধূ আজ পাংশুবর্ণা, কঙ্কালশেষা হইয়াছেন। তাঁহার দেহে মাংস নাই, কপোলে এবং অধরে রক্ত নাই, চক্ষু দুইটী বসিয়া গিয়াছে, ক্ষীণ দেহলতা ভাঙ্গিয়া কুব্জ হইয়াছে; কেবল সেই পূর্ব্বলাবণ্যের ছায়া হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ইনিই সেই সীতাদেবী বটেন।

তাঁহার পরিধান তপস্বিনীজনোচিত গৈরিক বসন, মস্তকে একটী মাত্র বেণী লম্বিত হইতেছে; অঙ্গ অলঙ্কার-শূন্য; কেবল কণ্ঠের স্ফটিকমাল্য ও হস্তের দুই গাছি কঙ্কন তাঁহার অবৈধব্য

সূচনা করিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া অন্তঃপুরচারিণীগণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। রামচন্দ্রেরও বোধ হইল, যেন, তাঁহার অধিষ্ঠান-ভূমি সরিয়া গিয়াছে, তিনি শূন্যে ঘূর্ণিত হইতেছেন। কিন্তু পাছে সভাস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে লঘুচিত্ত মনে করেন, এই জন্য তিনি, যথাশক্তি ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক, স্থির হইয়া বসিলেন।

এদিকে সীতাদেবী, অগ্রসর হইয়া, প্রথমে, বশিষ্ঠাদি ঋষি-গণকে, কৌশল্যাদি শ্বশ্রূদিগকে এবং তাহার পর, রামচন্দ্রকে প্রণাম করিলেন। রামচন্দ্রের বিশুষ্ক দেহ এবং অশ্রুকলঙ্কচিহ্নিত মুখ দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ-প্রায় হইল। তিনি রামচন্দ্রের পদে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া অবনত মস্তকে দণ্ডায়মানা রহিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি তখন গম্ভীর-স্বরে সভাস্থ ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;

"হে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়প্রমুখ পৌরজানপদবর্গ! রামচন্দ্র সীতাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবেন, আপনারা প্রফুল্লচিত্তে সম্মতি দান করুন। যে বিশ্বাত্মা ভূলোক ও দ্যুলোক ব্যাপ্ত করিয়া আছেন ; অগ্নি, জল, বায়ু, চন্দ্র এবং সূর্য্য অবিচ্ছেদে যাঁহার সত্ত্বার সাক্ষ্য দান করিতেছে, তিনি অবগত আছেন যে, সীতা অন্তরে, বাহিরে নিষ্পাপা।"

মহর্ষি এই বলিয়া নীরব হইলে সভাস্থলে একটী মহান্ কলরব উত্থিত হইল। মহর্ষি বশিষ্ঠদেব এবং সভাস্থ অধিকাংশ ব্যক্তিই "তথাস্তু তথাস্তু" বলিয়া মহর্ষির কথার সমর্থন করিলেন ; কিন্তু এক সম্প্রদায় নীরব রহিল এবং আকারেঙ্গিতে পরস্পরকে কি বলিতে লাগিল। সীতাদেবী মহর্ষির পার্শ্বেই দণ্ডায়মানা ছিলেন, তিনি একবার সভার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলেন। এই সকল লোকের ভাবভঙ্গী তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। নিজেকে নিষ্পাপা জানিয়াও নারীর প্রাকৃতিক ধর্ম্মে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত

হইল। তিনি রামচন্দ্রকে পুনর্ব্বার প্রণাম করিলেন, একবার সজলনেত্রে কুশ ও লবের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর অবনতজানু ও কৃতাঞ্জলি হইয়া ভূনত নেত্রে বলিলেন, “সর্ব্বংসহে ভূতধাত্রি! সহিষ্ণুতাগুণে সীতা যেন তোমার দুহিতা নামের যোগ্যা হয়। আমার সংসারের সাধ মিঠিয়াছে, মা! তোমার ক্রোড়ে আমায় স্থান দাও।”

কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার শেষ নিশ্বাস নিঃসৃত হইল এবং তাঁহার প্রাণহীন তনু, আকাশচ্যুতা তারকার ন্যায়, নিষ্প্রভ হইয়া সভাতলে পতিত হইল।

পৃথিবী সীতাদেবীকে বক্ষে গ্রহণ করিলেন। সীতাদেবীর দেহের রেণু, পরমাণু পৃথিবীর রেণু, পরমাণুর সহিত ওতপ্রোত ভাবে মিলিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের জীবনীশক্তি লোপ পায় নাই; পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিরাজিত থাকিয়া তাহা এখনও নারী-সমাজের কল্যাণ সাধন করিতেছে। যেখানে দেখিতে পাই, সংসারের সুখ, সম্পদ, ভোগ, বিলাস ত্যাগ করিয়া, মমতাময়ী সতী সর্ব্বস্বান্ত, বিপন্ন পতির দুঃখের অংশভাগিনী হইবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন, সেখানে মনে হয় সীতাদেবী বিরাজমানা। যেখানে দেখিতে পাই, প্রলোভন ও নির্য্যাতনকে সমভাবে পদদলিত করিয়া, তেজস্বিনী সতী আপনার ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, সেখানে মনে হয় সীতাদেবী আবির্ভূতা হইয়া অভয়বাণী উচ্চারণ করিতেছেন। আবার যেখানে দেখিতে পাই, পতির কর্ত্তব্যসাধনরূপ ব্রত উদ্যাপনের জন্য, আত্মত্যাগিনী সতী নিজেকে নীরবে বলি দিতেছেন, সেখানে মনে হয় সীতাদেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া অধিষ্ঠিতা আছেন।

ভারতমহিলাগণ! সীতাদেবী আপনাদিগের মধ্যে বিরাজিতা; জ্ঞাননেত্রে তাঁহাকে দর্শন করুন, জ্ঞানশ্রোত্রে তাঁহার বাণী শ্রবণ করুন, এবং প্রজ্ঞানে তাঁহাকে ধ্যান করুন, কৃতার্থা হইবেন; আর সেই সঙ্গে আমরাও কৃতার্থ হইব। *

সম্পূর্ণ।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত

অন্যান্য পুস্তক সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন।

পতিব্রতা।

হিন্দুমহিলার পাঠের উপযুক্ত কি উপাখ্যানগ্রন্থ আছে, সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে একথা জিজ্ঞাসা করিতে হয়। এতদিন পরে সে-প্রশ্নের উত্তর দিবার মত একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে সতী, সাবিত্রী, শকুন্তলা প্রভৃতি ভারতীয় পতিব্রতাকুলের অগ্রগণ্যা কয়েকটী মহিলার চরিত্র উপন্যাসাকারে, অভিনব প্রণালী-ক্রমে, বিবৃত হইয়াছে। সেই সঙ্গে প্রাচীন ভারতের দেশ, কাল, অবস্থা এবং রাজসভা, তপোবন, স্বয়ংবর-সভা প্রভৃতি এরূপ চিত্তা-কর্ষকরূপে বর্ণিত হইয়াছে যে, পাঠ করিলে সেই পুরাতন কথা গুলি নূতন বলিয়া মনে হইবে। এক সঙ্গে আনন্দ ও উপদেশ লাভের জন্য ইহার অপেক্ষা হিন্দু মহিলার উপযোগী কোন উপাখ্যান-গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই, ইহা আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি। ইহার ভাষা যেমন মধুর, ভাব তেমনি পবিত্র। পাঠ করিতে করিতে নয়ন অশ্রুসিক্ত এবং শরীর রোমাঞ্চিত হইবে। ধর্ম্মহীন, মাদক উপন্যাস পাঠের ফল হিন্দু-সংসারে অনেকেই অনুভব করিতেছেন। এক্ষণে এই শ্রেণীর গ্রন্থপাঠ কর্ত্তব্য কি না, সকলেই বিবেচনা করুন।

এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা; মলাট ও ছবি অতি চিত্তাকর্ষক। বিবাহে, জন্মদিনে, উৎসবে, নববর্ষে এবং বিদ্যালয়ের

পরীক্ষান্তে স্নেহ-পাত্রীকে যদি কোন পুস্তক উপহার বা পুরস্কার দিতে হয়, তবে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিমত।

"আপনার পতিব্রতা পাঠ করিয়াছি এবং বলা বাহুল্য, পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি। একে ত চিত্রিত চরিত্রগুলি পৌরাণিক পতিব্রতা-চরিত্রের শীর্ষস্থানীয়, তাহাতে আবার আপনার পবিত্র সিদ্ধহস্তে চিত্রাঙ্কনের পারিপাট্য পূর্ণতা লাভ করিয়াছে; সুতরাং এই গ্রন্থখানি যে অতি উপাদেয় হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। ইহা বঙ্গমহিলাগণের বিশেষ পাঠোপযোগী হইয়াছে এবং পাঠ করিয়া তাঁহারা একদা জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিবেন। উৎসর্গপত্রে যে অপূর্ব্ব সুন্দর কবিতাটী পাঠ করিলাম, তাহা সাহিত্য-ভাণ্ডারের একটি অমূল্য রত্ন।"

প্রবাসী বলেন ;—লেখকের ভাষা বিশুদ্ধ, সুললিত ও সুখপাঠ্য; পুস্তকখানি পাঠ করিলে নারীগণ যে বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন ও নির্ম্মল আনন্দ লাভ করিবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নব্যভারত বলেন ;—পড়িবার সময় শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে, বহুবার অশ্রুপাত হইয়াছে। এখানি গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় বঙ্গগৃহে প্রচারিত হউক ; আর ঘরে ঘরে অমৃত ফল ফলুক।

সঞ্জীবনী বলেন ;—যোগীন্দ্র বাবু মাইকেলের জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়া প্রথিতনামা হইয়াছেন। আমাদের মনে হয়, লিপি-কৌশল-গুণে পতিব্রতা মাইকেলকেও হারাইয়া দিয়াছে। হৃদয়স্পর্শী ভাষায়

রচিত হওয়াতে, পাঠক কোথাও সমবেদনার অশ্রুজল ফেলিবেন, কোথাও ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইবেন; কোথাও দুর্দ্দান্তের অত্যাচারে চণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিবেন। পতিব্রতা অতি সুন্দর, অতি মধুর হইয়াছে। আমরা সকলকে এই পুস্তক অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

হিতবাদী বলেন;—হিন্দু রমণীর পক্ষে এরূপ সুখপাঠ্য, উপাদেয় ও শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থপাঠের সুযোগ অনেক দিন হয় নাই। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

The Bengalee says;—We can unhesitatingly recommend this book to our ladies and we believe every home will be the better and the happier for its perusal.

মূল্য সাধারণ ১৲, রাজ সংস্করণ ১॥০ টাকা। ডাকমাশুল ৵০



মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত।

বিস্তৃত সংস্করণ মূল্য ২।৷০ ডাকমাশুল ৶০।

সংক্ষিপ্ত সুলভ সংস্করণ মূল্য ৷৷৵০ ডাকমাশুল ৵০।

এ গ্রন্থের পরিচয় দানের জন্য অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। বঙ্গভাষা যে অল্পসংখ্যক গ্রন্থ লইয়া গৌরবান্বিত, ইহা তাহাদিগের অন্যতম। বঙ্গের প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিগণ ও পত্রিকা-সমূহ ইহার সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, দেখুন;—

AMRITA BAZAR PATRIKA.—It may compare favourably with some of the best biographical works of the west.

INDIAN MIRROR.—Like the subject of the memoir, Babu Jogindra Nath Bose has immortalised himself by being the writer of the first biography, properly so called, in the Bengali Language.

BENGALEE.—It is a noble monument of the great poet. Every Bengalee, every lover of his country and his country's literature, should provide himself with a copy of the Book.

STATESMAN.—In the performance of the self-imposed task, which we can well believe was also a labour of love, the author has exhibited a conscientiousness which would have done credit to a German Savant.

সঞ্জীবনী।—যিনি এই পুস্তক পাঠ না করিবেন, তিনি বঙ্গসাহিত্যের একটী উজ্জ্বল রত্নের পরিচয় পাইবেন না। তাঁহার বঙ্গসাহিত্যের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

বঙ্গবাসী।—এমন পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় কেন, বোধ করি, অন্য ভাষাতেও অতি অল্পই থাকিবার সম্ভাবনা।

নব্যভারত।—পৃথিবীর যে কোন ভাষায় এমন গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে দেশবাসীর গৌরব হয়।

হিতবাদী।—মাইকেলের সৌভাগ্য যে, তিনি যোগেন্দ্র বাবুর ন্যায় জীবন-চরিত লেখক পাইয়াছিলেন।

মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।—আপনার এই গ্রন্থ অনেকাংশে অপূর্ব্ব; ইতিপূর্ব্বে বা ইহার পরে এরূপ জীবন-চরিত বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই।

RAJNARAYAN BOSE.—It is destined to be as immortal as the principal productions of the poet himself.

নবীনচন্দ্র সেন।—এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন-চরিত বাঙ্গালায় কখনও বাহির হয় নাই! ইহাতে আপনি কি শক্তি, কি কৌশ-

সহিষ্ণুতা, কি উত্তম দেখাইয়াছেন, তাহা যিনি এই অপূর্ব্ব জীবন-চরিত পড়িবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।—চরিতবর্ণনের গ্রন্থরচনায় কোন ব্যক্তি, কোন ভাষায় আপনার অপেক্ষা কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।—আপনার পুস্তক, সর্ব্বাংশে বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক দিকে একখানি আদর্শ পুস্তক হইয়াছে।

চন্দ্রনাথ বসু।—এমন প্রাণপণে, এরূপ সরল ও বিশুদ্ধ মনে, এদেশে এ পর্য্যন্ত, কেহ কাহারও জীবন-চরিত লেখে নাই।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।—কবিবর মধুসূদন যেমন কবিতারাজ্যে নবভাব ও নবশক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, তুমিও, তেমনি, জীবন-চরিতের নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া, বঙ্গসাহিত্যে কীর্ত্তি স্থাপন করিলে।

যাঁহারা অধিক মূল্যের পুস্তক-ক্রয়ে অসমর্থ, তাঁহাদের জন্য সংক্ষিপ্ত সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। আপনি যদি এতদিন এই গ্রন্থখানি পাঠ না করিয়া থাকেন, তবে আমাদিগের বিনীত অনুরোধ, ইহা একবার পাঠ করুন। বাঙ্গালা সাহিত্যে কি একখানি সুন্দর গ্রন্থ আছে, আপনি তাহার পরিচয় পাইবেন।

সরল কৃত্তিবাস-রামায়ণ।

সরল কাশীরাম দাস-মহাভারত।

প্রত্যেক হিন্দু মাতাপিতাই ইচ্ছা করেন যে, তাঁহাদের পুত্র-কন্যাগণ রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করেন; কিন্তু ইহাদিগের কোন কোন স্থল বর্ত্তমান কালের রুচিসঙ্গত নহে। এইজন্য অসার ও অশ্লীল অংশ বর্জ্জন করিয়া এবং উৎকৃষ্ট অংশ রক্ষা করিয়া বালক-বালিকাগণের ও সেই সঙ্গে মহিলাদিগের পাঠের জন্য এই দুই গ্রন্থ সম্পাদিত হইয়াছে। কৃত্তিবাসের ও কাশীরাম দাসের জন্মভূমি, বদরিকাশ্রমস্থিত মন্দির, গঙ্গোত্রী, কৈলাশপর্ব্বত, বাল্মীকির ও ভরদ্বাজের আশ্রম, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, গিরিব্রজপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ প্রভৃতি স্থানের দুর্লভ চিত্রের সঙ্গে বঙ্গদেশের প্রতিষ্ঠাবান্ চিত্রকরদিগের অঙ্কিত অনেকগুলি চিত্রের হাফ্‌টোন ব্লক ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। স্থান নির্দ্দেশের জন্য প্রাচীন ভারতের মানচিত্র এবং পরিশিষ্টে দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দের অর্থ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ অতি উৎকৃষ্ট। এ দেশে বালক, বালিকাদিগের উপ-যোগী কৃত্তিবাস, কাশীরামদাসের এরূপ সংস্করণ আর প্রকাশিত হয় নাই। উপহার ও পুরস্কার দানের জন্য এই দুই গ্রন্থ অতুলনীয়। রামায়ণের মূল্য ১॥০, মহাভারতের মূল্য ২৷০।

SIR ASUTOSH MUKERJEE, M. A. D. L. VICE CHANCELLOR Calcutta University রামায়ণ সম্বন্ধে

লিখিয়াছেন ;—"I have read with great pleasure and interest your edition of the Ramayan of Krittibash. The Selection is admirable, and no one, who does not know the original, would suppose that any thing has been left out. It is a book which ought to be read by every student of these Provinces.

মহাভারত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—" I have read with great interest and delight the abridged edition of the Mahabharat of Kashiramdas, prepared by my friend, Babu Jogindra Nath Bose. The work has been carried out with extreme care and faultless judgment. The book which is admirably got up and nicely illustrated should be placed in the hands of every Bengali boy and girl who will, I trust be saturated with the ideals presented in our great national epic.

যোগীন্দ্রবাবুর রচিত অহল্যাবাই, কবিতা-প্রসঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত পুস্তকই আমাদিগের নিকট পাওয়া যায়।

কবিভূষণ শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত।

১। তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছুর জন্য কঠোপনিষৎ-কবিতানুবাদ

২। স্বদেশ-প্রেমিকের জন্য পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য

৩। ” ” শিবাজী মহাকাব্য

৪। শিক্ষার্থী শিশুর জন্য রামায়ণের ছবি ও কথা

৫। ” ” ছবি ও কবিতা ১ম ভাগ

৬। ” ” ঐ ২য় ভাগ

৭। সাহিত্যরসজ্ঞের জন্য মাইকেলের জীবন-চরিত

৮। ” ” ঐ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ

৯। ব্রহ্মচারিণী বিধবার জন্য অহল্যাবাঈ এর জীবন-চরিত

১০। ভক্তিপিপাসু সাধুর জন্য তুকারামের জীবন-চরিত ॥৵

১১। হিন্দু মহিলার জন্য পতিব্রতা ১ম ভাগ ১॥০

১২। ” ” ঐ ২য় ভাগ ১॥০

১৩। ” ” সরল কৃত্তিবাস ১॥০

১৪। ” ” সরল কাশীরাম দাস ২॥০

প্রত্যেকটী স্বস্বশ্রেণীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কিনা বিচার করুন। ইতি

অধ্যক্ষ—সংস্কৃতপ্রেস ডিপজিটরী ৩০ নং কর্ণওয়ালিস

” সাহিত্য ভাণ্ডার ২০৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট